# ভাবনায় যুগপুরুষ কেশবচন্দ্র ও ভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দীপ্তিময় রায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা-৬

# উৎসর্গ

পিতৃদেব নলিনকুমার রায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

# মুখবন্ধ

ঈশ্বর পরায়ণ, ঐক্যসাধক, ধর্ম ও সমাজ নেতা, মানব হিতৈষী যুগপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে এক বিরাট মানুষ। সে যুগের ভারতীয় সমাজ ও ধর্মজীবনেব ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁদের কাছে কেশবচন্দ্রের কীর্তিকথা অজানা নয়। মনে হয় যুগাবতার রামকৃষ্ণ লীলায় যুগপুরুষ কেশবচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে যার যথাযথ রূপায়ণ হওয়া দরকার।

ব্রহ্মানন্দ কেশব ছিলেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের বন্ধু—বিশেষ প্রিয়জন।

রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের প্রতি ছিলেন গভীর-ভাবে প্রেমাবদ্ধ, অন্যদিকে কেশবচন্দ্রও রামকৃষ্ণকে গভীর ভালবাসতেন ও আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন।

চিন্তাধারায় ও মতাদর্শে স্থূলভাবে কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রকৃত পক্ষে উভয়ে একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। কেশবচন্দ্র নিঃসন্দেহে স্ব মহিমায় ভাস্বর ছিলেন কিন্তু রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মনের অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হয়েছিলেন এবং নিজ উপলব্ধিকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছিলেন। মনের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি রামকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেন। প্রকৃতই আত্মায় আত্মায় দু'জনে ছিলেন আত্মীয়।

কোন কোন লেখকের লিখিত পুস্তকে দেখা যায় যে কেশবচন্দ্রকে তাঁরা রামকৃষ্ণের শিষ্যরূপে বিবেচনা করেছেন। এ'দের অনেকেরই ধারণায় কেশবচন্দ্র ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত, ঈশ্বরভক্ত উদার মানুষ। তিনি ব্রাহ্মধর্মের নেতা হয়ে সমাজের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নানারূপ সংস্কার কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি তাঁর মতধারার পরিবর্তন করেন: তিনি রামকৃষ্ণের প্রভাবে মাতৃনাম ও হরিনাম ব্রাহ্মসমাজে চালু করেন। কেউ কেউ আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কেশবচন্দ্রের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে গড়া যে 'নববিধান' সেটিও রামকৃষ্ণের প্রভাবজনিত ফল। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে ঠিকমত বুঝতে পারেন নি এ ধরণের মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন।

ধর্মসম্প্রদায়গত বা নীতিগত বিরোধে এ সকল চিন্তা বা আলোচনার উদ্ভব হ'তে পারে, কিন্তু কেশবচন্দ্র ও তাঁর মতাদর্শের মধ্যে এ'রা কেন যে ভারতীয়ত্বের কিছু পেলেন না সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :—

"ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত পুরাতন ঋষিবাক্য উদ্ধার করবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এসেছিলেন। * * * যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা এবং তাই নূতন করে তিনি লাভ করে নূতন করে নববিধান বলে প্রকাশ করেছেন।"

[ সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ
কেশব মৃত্যুবার্ষিকী সভা স্কটিশ চার্চ কলেজ ৮, ১, ১৯১০ ]

তাই দেখা যায় কেশবচন্দ্র সম্পর্কে সমালোচকদের অনেক উক্তিই যথার্থ নয়।

অন্যপক্ষে লক্ষ্য করি কেশবচন্দ্রের অনুরাগী কেউ কেউ সরলদৃষ্টি নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সম্পর্কের বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করেন নি। পরমহংস রামকৃষ্ণকে অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয়ত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শানুকূল না হ'তে পারে ( কেশবচন্দ্র কিন্তু পরোক্ষে রামকৃষ্ণকে অবতার সদৃশ বলেছেন যেমন তিনি একবার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "উনি নাইনটিনথ সেঞ্চুরির চৈতন্যদেব।" ), কিন্তু রামকৃষ্ণ তো আদৌ মামুলি সাধু সন্ন্যাসী গোছের মানুষ ছিলেন না, তাঁর মহামানবত্ব বা বিশেষত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যেত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ কর্তৃক কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না আর মনে হয় এর দ্বারা উভয়েই আরও মহীয়ান আরও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

জগদম্বা মহেশ্বরীর ইচ্ছাতেই রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মিলন ঘটেছে। সাধনমার্গে দু'জনেই ভিন্ন পথের পথিক। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী আর কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর। রামকৃষ্ণ ছিলেন কেশবচন্দ্রের চেয়ে দুই বছরের বড়। তিনি সাধারণ গৃহস্থের সন্তান। তাঁর পিতামাতার ঈশ্বরভক্তি ছিল অতুলনীয়। লেখাপড়া পাঠশালা পর্যন্ত বলা চলে। অতি সাধারণ ভাবে তাঁর প্রাথমিক জীবন গড়ে উঠেছিল। তবে অলৌকিক বহু নিদর্শন ছিল। তাঁর সারল্য ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য তিনি বালক ও কিশোর বয়সে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছিলেন। কিন্তু অবতার পুরুষের লক্ষণযুক্ত হ'লেও তাঁর অ-লৌকিক মাহাত্ম্য তখন সাধারণের মধ্যে তেমন প্রতিভাত হয় নি। তারপর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীতীর্থে ভবতারিণীর মন্দিরে সাধনা করলেন, সন্ন্যাসী ও ভৈরবীর কাছ থেকে সাধন পদ্ধতি শিক্ষা করলেন, সকল ধর্মের গূঢ়তত্ত্বের সঙ্গে দিব্য ভাবে পরিচিত হলেন। তাঁর পরমজ্ঞান লাভ হ'ল। তিনি জগদম্বা বা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হলেন। জগতের বৃহৎ প্রয়োজনের জন্যই সম্ভবত রামকৃষ্ণের এই প্রস্তুতি। না হলে কি এ সবের দরকার ছিল? তিনি এমনিই তো মুক্ত মহাপুরুষ।

অন্য দিকে কেশবচন্দ্রের প্রাথমিক জীবন এক ধারাবাহিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বর্দ্ধিষ্ণু ভক্ত পরিবারের সন্তান। নিজেও প্রথম জীবনে উচ্চপদে কর্ম করতেন। তিনি কৈশোরারম্ভে পিতৃহীন হয়েছিলেন এবং ক্রমে নিজের মধ্যে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধির জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে আত্মচিন্তা, প্রার্থনা ও ধ্যানই তাঁর সাধন পথের অবলম্বন হয়। কোনও বিশেষ মার্গাশ্রিত না হ'য়েও তিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের মধ্যে মনের মিল খুঁজে পেয়ে তিনি পরে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। কিছুটা ভিন্ন রূপের হলেও রামকৃষ্ণের মতই ঐক্যসাধক কেশবচন্দ্র জগতের সর্বধর্মের মধ্যে এক মহামিলনের সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসী, প্রথিতযশ বাগ্মী, জন-কল্যাণ ও নানাবিধ সমাজ সংস্কারে অগ্রণী নেতা, লোকপ্রিয়, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-ঐক্য-বোধের সাধক তিনি। বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর খ্যাতি। সে যুগের যুগ পুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। জাতির পুনর্জন্মের জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন তার এই বিশ্বাস ছিল।

কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাধারণের সঙ্গে রামকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উদ্দেশ্যহীন ভাবে হয়নি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেরও কর্মভাবনা ও জীবন সাধনার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, কারণস্বরূপ সেই মহান বাণীটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—হে ভারত! যখন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম প্রবল হয়, তখনই আমি জন্মগ্রহণ করে থাকি। সাধুদের রক্ষার জন্য আর দুষ্টদের নাশের জন্য এবং ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি—ভগবানের এই উক্তি গীতায়।

কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও উভয়ে ছিলেন ঈশ্বর প্রেম পাগল ও ঐক্য সাধক। উভয়ের জীবনাদর্শে আবার বেশ কিছু মিলও দেখা যায়। উপলব্ধ যে স্বর্গীয় আলোক রামকৃষ্ণের মধ্যে ছিল, সে আলোকই কেশবচন্দ্রের হৃদয় আলোকিত করেছিল।

প্রয়োজনের তাগিদেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও কেশবচন্দ্রের উত্থান। সে যুগ ও তার পূর্ববর্তী কালের অবস্থা বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে তখন হিন্দু সমাজ জীবনে ও ধর্মে যথেষ্ট গ্লানি জড়ো হয়েছিল। ধর্মীয় উদারতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল, ধর্ম জীবন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কুসংস্কার, নীচতা, হীনতা ও স্বার্থপরতা ধর্মীয় সংহতিকে প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। সাধারণ মানুষকে দিতে পারছিল না চেতনালোক। দেশের যুবসম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়ে গেল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাদের বিচার বুদ্ধি শক্তিসম্পন্ন হ'ল ঠিকই কিন্তু অধিকাংশই নিজ সমাজ ও ধর্ম থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। সমাজ ও ধর্ম জীবনের কুসংস্কার ও মিথ্যাচার তাদের অনেককেই হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম বিচার আর অহমিকা নিয়ে বিকাশপ্রাপ্ত চিন্তাধারাকে তারা হারাচ্ছিল, নকল করে চলছিল ইংরাজের ভালমন্দ সবকিছু, তাদের মন্দ স্বভাবগুলো করায়ত্ত হচ্ছিল, মদ্যপানের যথেচ্ছাচার দেখা গিয়েছিল, অনেকে নাস্তিক হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছিল, আবার অনেকে নিজ ধর্মের প্রতি বীতরাগ হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নিজ ধর্ম বিসর্জন দিচ্ছিল। পরাধীন জাতি সেদিন যেন ব্রিটিশের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ছিল। আর মাতৃজাতিকেও অতলে তলিয়ে রাখা হচ্ছিল।

এই যুগ সন্ধিক্ষণে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবী অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহনের আবির্ভাব ঘটল। হিন্দুসমাজ তথা ধর্মের পুঞ্জিভূত কুসংস্কার, দুর্নীতি ও বিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হিন্দুধর্মেরই সংস্কার করে পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি করলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়। ভারতের প্রথম বিশ্বপ্রেমিক মানুষ।

বাস্তবিক ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম হ'তে উদ্ভূত এবং তারই এক পরিশুদ্ধ রূপ। পরে অবশ্য 'নববিধান' ধর্মে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব গৃহীত হয়েছিল। একেশ্বর বাদ, ঈশ্বরকে নিরাকার রূপে কল্পনা এবং কতকগুলি হিন্দু পদ্ধতি ও সংস্কার রহিত করে ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি—প্রকৃত হিন্দুধর্মের আদর্শের উপরেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মধর্মীয় চিন্তাধারাকে যদি হিন্দুধর্মেরই এক বিশিষ্ট রূপ হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় তবে কোন কোন দিক থেকে আপত্তি উঠতে পারে কিন্তু বিষয়টি বিচার সাপেক্ষ।

যা হোক রাজা রামমোহন রায়ের পর থেকে ব্রাহ্মধর্ম ক্রমবিকাশের পথে জ্ঞানমার্গ ধরে ভক্তিমার্গের মধ্যে বিকাশ লাভ করল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময়। এইরূপে রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হ'ল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পন্থা ও ভাবের গুরুত্ব রয়েছে।

ব্রাহ্মধর্মের কর্ম ও ভাবাদর্শ রামকৃষ্ণ-ভাবধারা মূর্ত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল বলে আমার মনে হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই দেশের মানুষ রামকৃষ্ণের কথা জেনেছিল। ঈশ্বর প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয় কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের অমৃত-কথায় তাঁরই অন্তরস্থিত আলোর মূর্তরূপ দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে এত বেশী মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন রামকৃষ্ণের কথা, তাঁরই মত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবার জন্য সকলকে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখতে আহ্বান করেছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণের বন্ধু—প্রিয়জন—মনের মানুষ। তাঁদের ঐ মধুর সম্পর্কটিই ইতিহাস অবিকৃত রেখে যথাযথভাবে চিত্রায়িত করা হল।

৮

"হৃদু, কলকাতা চল কেশবকে দেখব।"

রামকৃষ্ণ তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে বললেন, "শুনেছি সে এক বিরাট মানুষ—পরম ধার্মিক—কর্মবীর। মানুষকে সত্য পথ দেখাচ্ছে। চল তার সঙ্গে আলাপ করে আসি। তাকে দেখে আসি একবার।"

সরল শিশু ভোলানাথের মত মানুষটি যখন যাব বলেছেন তখন নিয়ে যেতেই হবে। ভাগনে হৃদয় সঙ্গে না থাকলে মামার আজকাল একেবারেই চলেনা। কে হাত ধরে ওঠাবে বসাবে রামকৃষ্ণকে? কাপড়ের আঁট পর্যন্ত ঠিক থাকে না তাঁর। ভাবের ঘোরে টলমল পা পড়ে বেতালে।

আর যখন ভাব-সমাধি হবে তখন? হরিনাম শুনিয়ে, কালীর নামোচ্চারণ করে ভাব-সমাধি কে ভাঙ্গাবে ভাগনে হৃদয় ছাড়া।

তাই হৃদয় কাছে না থাকলে আজকাল রামকৃষ্ণের চলছেনা। মার মতন সর্বক্ষণ তাঁর মামাকে তিনি আগলে আছেন।

বৃহৎ শিশু রামকৃষ্ণ—শিশু ভোলানাথ।

—"চল মামা, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে"—

এরকম কতবার রামকৃষ্ণকে নিয়ে যেতে হয়েছে। সঙ্গে কখনও মথুরামোহন, কখনও হৃদয় মুখুজ্জে, কখনও বা অন্য কেউ ছিল।

রামকৃষ্ণ দেবেন ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছেন, আগে একবার কেশব সেনকেও দেখেছেন যদিও তখন পরিচয় ছিলনা—শুধু চোখের দেখা। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর বাড়ি গেছেন। দেখা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। দত্ত কবি মধুসূদনকেও রামকৃষ্ণ দেখেছেন।

এ'রা সব নামী লোক—গুণী লোক। তাই তিনি এ'দের দেখতে গেছেন। এ'দের মধ্যে কতখানি ঐশ্বরিক আলো প্রকাশিত তাই দেখা। যদি সন্ধান মেলে আলোর।

রামকৃষ্ণ এ'দের সঙ্গে একে একে দেখা করেছেন। কাউকে বুঝতে, কি যেন খু'জতে, কাউকে বা কৃপা করতে।

'উচ্চস্তরের মানুষগুলো আসবে কি কেউ আমার নগণ্যতার মধ্যে? আমি যে দীনের দীন, তৃণের তৃণ। তাই চল সাধু সঙ্গ করি। মরমী না পেলে মনের কথা কইব কার সঙ্গে বল? সাধু সঙ্গে চিত্ত যে নির্মল হয়—উজ্জ্বল হয়।' রামকৃষ্ণের মনের যেন এই ভাব।

রামকৃষ্ণ সাধু সঙ্গে অভিলাষী। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস—সাধুর মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান।

এ ভাবে অনেক গুণী-মানী-জ্ঞানী লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল।

কে বলবে কে কার কাছ থেকে আলো পেয়েছিল। তবে কারও সঙ্গে তেমন জমজমাট ভাব হয়নি রামকৃষ্ণের। ওরা তাঁর মনের মানুষ নয়।

কিন্তু ব্রাহ্ম কেশব সেন? নব ভারতের নব-দিশারী পরমব্রহ্মের নৈষ্ঠিক পূজারী ব্রহ্মের প্রিয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র?

এখনও পরিচয় হয়নি; হয়নি মনের চোখ দিয়ে চেনা। তাই কেশবকে দেখবার জন্য রামকৃষ্ণ উদ্‌গ্রীব। যদি দেখা মিলে মনের মানুষের।

কেশবচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা তিনি লোকমুখে শুনতে পান। বাংলার কোন্ মানুষ না জানে কেশবকে। শুধু কি জানা? তাঁকে কত লোকে অনুসরণ করে পথ পাচ্ছে, ভালমন্দ কত আলোচনা করছে, করছে বিরূপ সমালোচনাও। তাঁর কথায় মানুষ অবাক হচ্ছে, মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছে। ভারতের আলো বাতাসে কেশবের যশ-সৌরভ ছড়ান। নব-ভারতের একজন কারিগর তিনি। ঈশ্বর প্রেমিক, ধার্মিক, বিনয়ী, সর্বধর্মে সমদর্শী, সমাজ সংস্কারক, নারী জাগরণের দিশারী, প্রদীপ্ত বক্তা, প্রতিভার উজ্জ্বল মাণিক্য ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কি না করে চলেছেন কেশব। অপূর্ব কর্মপ্রবাহ তাঁর! মানুষের মনে চেতনার আলোকবর্তিকা রামমোহনের পরে এমন করে আর কে জ্বালিয়েছে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের পরই দেশের প্রগতি-চেতনার বাহক। রামমোহনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে এই দুই মণীষী চেতনার দীপশিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন—কেশবচন্দ্র সেই শিখাকে সম্প্রসারিত করে আরও আলোক ছড়িয়ে দিলেন।

কেশবের কর্মকৃতির কথা রামকৃষ্ণ লোকমুখে কিছু কিছু শুনেছেন। কেশব ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল—পাগল প্রায়। এসব জেনে রামকৃষ্ণ উৎসাহী হয়েছেন। তাই কেশবের সঙ্গে আলাপ করতে চান। মনের মানুষ না পেলে আর একদিনও তাঁর চলছে না। কেশব কি হবে তাঁর মনের মানুষ?

তখনও আলাপ-পরিচয় হয়নি, কেশবচন্দ্রকে চিৎপুরের আদি ব্রাহ্মসমাজে একবার শুধু দেখেছিলেন—চোখের দেখা। কেশবকে দেখে খুশী হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ সেদিন। সময়টা ১৮৬৩ কিম্বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। দিনটি ছিল বুধবার। রামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির জামাতা সেজবাবু মথুরামোহনকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখতে গিয়েছিলেন। অভিলাষ ছিল দেখবেন সেখানে কি হয়—ঈশ্বরের জন্য কতখানি ব্যাকুল সেখানকার ব্রাহ্মভক্তরা। শুনেছেন তারা নাকি ধ্যানধারণা করে—ঈশ্বরের নাম গায়।

কেশবচন্দ্র সে সময় ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও বয়স অল্প তবু তাঁর প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও ব্রহ্মপ্রেমের পরিচয় পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে সমাজের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেছিলেন।

সেদিনের সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ যখন আদিসমাজে এসে পৌঁছুলেন তখন উপাসনা শেষ করে ব্রাহ্মভক্তরা ধ্যানে বসেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই ধ্যানরত। কি আর করা যাবে, রামকৃষ্ণ ভাবলেন, কথাবার্তা যখন হবেনা তখন নীরবে দেখেই যাওয়া যাক এ'দের ধ্যানের পরিধি। ধ্যান দেখেই ধ্যেয় কতদূর বোঝা যাবে। তিনি সেজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে এক এক করে ধ্যানরত সকলকে খুঁটিয়ে দেখলেন। অঙ্গুলি সঞ্চালনে মথুরামোহনের দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করে বললেন ঠিক

ঠিক ধ্যান হচ্ছে। প্রশংসা করলেন তাঁর। সেজবাবুর কাছ থেকে তাঁর পরিচয় পেলেন। কিছু দূরে প্রায় মাঝখানে আচার্য কেশবচন্দ্র ধ্যানাসীন।—নিতান্তই যুবক অথচ দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ।

সেদিকে নজর পড়তেই রামকৃষ্ণ প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া আর যাঁদের দেখছিলেন তাঁরা তো ফাঁকিই দিচ্ছে। কারও মন শেকড় গেড়ে বসেনি। হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দেয়নি। মন যদি না ডুবল সেই অতলে তবে একি ধ্যান ধ্যান খেলা বাপু! না কি খেলতে খেলতেই বুঝি বুড়ী ছোঁবে কেউ কেউ? রামকৃষ্ণ যখন এই কথা ভাবছিলেন তখনই কেশবকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

আরে কে ও গম্ভীর তাপস! নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানমূর্তি! সৌম্য, প্রশান্ত, ওজঃপূর্ণ—চমৎকার কান্তি! মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় আলো ছড়ান! কে ওই ধ্যানগম্ভীর—কমনীয়?

রামকৃষ্ণের কাছে মথুরামোহন আচার্য কেশবের পরিচয় দিলেন। বড় ভাল লাগল দেখে শুনে। সেজবাবুকে হেসে হেসে বললেন, "দেখ এরই ফতা (ফ্যাৎনা) ডুবেছে। বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।"[১] অর্থাৎ কেশবের বড়শীতেই মাছ বিঁধবে। তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরে ধ্যানরূপ ছিপ ফেলছেন আর সচ্চিদানন্দরূপ মীনও ঠিক টোপ খাচ্ছে। এ আধার অতি উত্তম। ঈশ্বর এঁর কাছে কাছে।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আলাপের প্রায় বারো বছর পূর্বের ঘটনা এটি। তখনও তাঁর কথা রামকৃষ্ণ বিশেষ কিছুই শোনেন নি। এতখানি দেশজোড়া নামও হয়নি কেশবের। তবুও রামকৃষ্ণ তাঁকে ঠিকই চিনেছিলেন। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে কেশবের মন ডুবেছে। দেখ কত রত্ন পায় সে। ডুবুক ডুবুক। খুশীর আবেগ নিয়ে রামকৃষ্ণ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরেছিলেন।

কেশবকে তিনি আরও একবার দেখেছেন। সমাধিতে দেখা। জগজ্জননী তাঁকে জানিয়েছিলেন যার কোন্ কোন্ ভক্ত তাঁর কাছে আসবে। কারা এসে রচনা করবে ঈশ্বরীয় পরিমণ্ডল। তাদের মধ্যে কেশব একজন। সমাধিতে দিব্যনয়নে রামকৃষ্ণ দেখেছিলেন অনুগতদের সঙ্গে নিয়ে কেশব তাঁর সম্মুখে বসে আছেন। তাঁকে দেখাচ্ছে যেন একটি মনোরম ময়ূর পাখা বিস্তার করে বসে। পাখা মানেকেশবচন্দ্রের দলবল। রামকৃষ্ণ আরও দেখলেন ময়ূররূপী কেশবের মাথায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একটি মণি। ওটি কেশবের রাজসিকতার ঔজ্জ্বল্য। কেশব রামকৃষ্ণের দিকে ইঙ্গিত করে অনুগতদের বলছেন,—

"এঁর কথা তোমরা শোন।"[২]

সমাধি অবস্থায় রামকৃষ্ণ এই দৃশ্য দেখেছিলেন তাই তিনি বুঝেছিলেন কেশবচন্দ্রকে তাঁর প্রয়োজন। তবু সরাসরি কেশবকে দর্শন করতে গেলেন না রামকৃষ্ণ। দেখা করার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠালেন।

—"যাও দেখে এস কেমন মানুষ সে। কত নাম তার, কত যশ। কুইনের (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার) সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ! কেশব কি যে সে লোক!"[৩]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ২য় পরিচ্ছেদ। এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৩য়), পৃঃ ১৬৩

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ২৫৭

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৫

রামকৃষ্ণ শুনেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশব নাকি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পান। এ কথা শুনে তিনি আরও ব্যাকুল হয়েছেন তাঁকে দেখবার জন্য। এ যে তাঁর নিজের ঘরের লোক!

মন অস্থির তবু কিন্তু কিন্তু ভাব রামকৃষ্ণের। "অতবড় মানুষটার সঙ্গে কথা বলব? যার লেকচার শুনতে দলে দলে লোকে ভীড় করে! কঠোর চিত্ত গলিত হয়ে কেঁদে বুক ভাসায়! কি না কি বলে ফেলব হয়ত। তাই যাও দেখে এস সে কেমন মানুষ, কেমন তার মন মেজাজ।" রামকৃষ্ণের মনের ভাব এইরকম। আসলে কেশবের অহংকারের আঁচ বুঝতে চান তিনি। রুক্ষ না স্নিগ্ধ তাঁর অহংকার। জগন্মাতা তাঁকে জানিয়েছেন মার কোন্ কোন্ ভক্ত আসবে তাঁর কাছে। কত কাজ হবে।

তাই হৃদয় ব্যাকুল—মন অস্থির।

কখন সে সব হবে?

এবার রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ বুঝি কর্মপ্রবাহে তরঙ্গায়িত হতে চায়।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণ শাস্ত্রী দেখা করলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শুধু পণ্ডিতই নন সাধকও। রামকৃষ্ণকে খুবই ভক্তি করেন। জ্যোতির্ষবিদ্যাও ভালরকম জানা আছে তাঁর। দু'জনার মধ্যে নানা কথার আলাপ হ'ল। শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ করলেন, কেশব বাংলায় কথা বললেন। আলাপ-আলোচনায় আনন্দ পেলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। কেশবচন্দ্রকে তাঁর খুব ভাল লাগল। ফিরে এসে রামকৃষ্ণের কাছে কেশবের প্রশংসা করে বললেন,—"কেশব সেনের ভাগ্য খুব ভাল দেখলাম। আর উনি তো জপে সিদ্ধ।"

ঈশ্বরের নাম গানে সিদ্ধ কেশব।

ভাগবৎ প্রেমে সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্ম কেশব। আসলে কিন্তু ঈশ্বরের কৃপাতে সিদ্ধ কেশব 'কৃপাসিদ্ধ।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের প্রথম পর্বে নতুন ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং যুগপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের উত্থান। যুগবতার রামকৃষ্ণ তখনও অবতার বিবেচনায় মানুষের মনে আসনলাভ করেন নি। তিনি রয়েছেন অন্তরালে। তাঁকে দু একজন ছাড়া তেমন কেউ চেনেও না। ভবতারিণীর কৃপাধন্য আপন-ভোলা ঈশ্বর-পাগল মানুষটির মাহাত্ম্য অমৃত-হৃদয় কেশব ছাড়া কেই বা বুঝবে? সারা দেশে আর মানুষ কই এমন—যেমন উদার তেমনই মহৎ আর উজ্জ্বল। অবতার পুরুষ ও যুগপুরুষের পুণ্য মিলন বুঝি ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত।[১]

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, "চল কেশবকে দেখে আসি।" হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে ভাড়াকরা একটা ঘোড়াগাড়ী করে রামকৃষ্ণ কলকাতায় এলেন। কলুটোলায় কেশবের বাড়ীতে।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অপূর্ব ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, সরলতা, মমতা, পবিত্রতা ও ত্যাগের পরিচয় পেয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশব বিমুগ্ধ হন এবং তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সাধারণের মধ্যে পরিচিত করেন। উদার হৃদয় কেশব ছিলেন গুণগ্রাহী। মানুষকে ধর্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বিভিন্নরূপে ভারতের তথা বিশ্বের ধর্মগুরুদের চরিত্রকথা তাঁর ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। যেখানে দেখেছেন আলো, সেখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন আলো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পেয়ে কেশবচন্দ্র সেই একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু কোথায় কেশব ? তিনি বাড়ি নেই। সমস্ত পথ চেয়ে যাকে দেখব বলে ছুটে আসা দেখা মিলল না তার !

রামকৃষ্ণ আসছেন এ কথা কেশবের জানা নেই। খবর দিয়ে আসেন নি।

কি আর করা যাবে। দেখা যখন হ'ল না ফিরেই যেতে হবে। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া যাক কেশব কোথায় আছেন। না হয় সেখানে গিয়েই কেশবের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি।

জানা গেল কেশব আছেন বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে তাঁর অনুগতদের সঙ্গে। স্থানটির নাম রেখেছেন 'তপোবন'। এখানে ব্রাহ্মভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে তিনি সাধন ভজনে ব্যাপৃত আছেন। এমন মাঝে মধ্যে সংসারের কলকোলাহল থেকে নির্জনে ঈশ্বরের নামকীর্তনে দিনযাপন করেন কেশবচন্দ্র। তবে বিরলে একাকী নয়, তিনি ঈশ্বর-আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে আস্বাদন করতে চান। চিত্তশুদ্ধির জন্যই সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নিভৃতে গিয়ে তাঁর সাধন ভজন।

কেশবের এই ব্যাপার শুনে পুলকিত হলেন রামকৃষ্ণ। মিলে যাচ্ছে মনের সঙ্গে। এমনতরই তো হবে তাঁর মনের মানুষ। দেখা করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। পরদিনই আবার হৃদয়কে ধরলেন ;—

—"চ রে হৃদু বেলঘোরে যাই, কেশবকে দেখে আসি।"

—ইংরাজি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। মার্চের পনেরো তারিখ। সুনির্মল সুন্দর দিন। শান্ত সমীরণ মৃদু মৃদু বইছে। রামকৃষ্ণ ও হৃদয় ঘোড়াগাড়ীতে বেলঘরিয়ায় চললেন। ঘোড়াগাড়ীটি কাপ্তেনের—কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। এ'রা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রামকৃষ্ণকে ভক্তি করেন। কাপ্তেনের গাড়ী করে রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে এখানে সেখানে আসাযাওয়া করেন।

কেশবকে পছন্দ নয় কাপ্তেনের। রামকৃষ্ণ যে কেশবের কাছে যাবেন এতে তাঁর সায় নেই।

—"কেশববাবুর ওখানে গিয়ে কি হবে ? উনি কি আর সাধু ?"

"সেকি ? কেশব ঈশ্বরের কথা বলে, তাঁর ধ্যান করে। কত লোকে তাঁকে মানে !" রামকৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময়, মনে কেশবের কাছে যাবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয়তা।

বাধা দেওয়া যাবে না জেনে কাপ্তেন নিজেকে গুটিয়ে নেন :—"তা আপনার সেখানে যখন যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"[১] রামকৃষ্ণ ও হৃদয় গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী ছাড়ল।

বেলা একটা নাগাদ তাঁরা কেশবের 'তপোবনে' এসে পৌঁছুলেন। গাড়ী এসে দাঁড়াল উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।

পূর্বদিকের ঘাটের উপরে উঁচু বেদীর 'পরে কেশব ও তাঁর অনুগতেরা বসে রয়েছেন। তাঁরা সবাই মুখ হাত ধোবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। সেই সঙ্গে ঈশ্বর-কথা, .কীর্তণ গান

[১] পরবর্তীকালেও কেশবের বাড়ি গেলে কাপ্তেন বেজার হয়েছেন কিন্তু তাঁকে আটকাতে পারেন নি। একবার রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি বাপু টাকার জন্য লাট-সাহেবের কাছে যেতে পার আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না ? সে ঈশ্বর-চিন্তা করে, হরিনাম গায়।" [ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ( ১ম ), পৃঃ ১৭৮ ]

এসবও চলছে। বেলা অনেক হয়েছে—হাত মুখ ধুয়ে সকলে সামান্য কিছু ভোজন করবেন। এমন সময় রামকৃষ্ণ আর হৃদয় এসে পৌঁছুলেন। কেশবরা দূর থেকেই তাঁদের দেখলেন—তেমন কৌতূহল জাগল না কারও মনে।

রামকৃষ্ণকে গাড়ীর মধ্যে রেখে হৃদয় একা নেমে সেদিক পানে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে পৌঁছে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। গাড়ীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কেশবকে বললেন, "আমার মামা রামকৃষ্ণ এসেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে থাকেন। জগন্মাতা কালীর ভক্ত। হরিকথা, হরি গুণগান শুনতে বড় ভালবাসেন। শুনতে শুনতে ভাব সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বর কথা শুনতে এসেছেন। অনুমতি হলে তাঁকে নিয়ে আসি। আমরা কলুটোলা গিয়েছিলাম কিন্তু আপনি এখানে আছেন শুনে এসেছি।"

কথা শুনে কেশব মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন ও বললেন, "ওঁকে নিয়ে আসুন।" হৃদয় এগিয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে রামকৃষ্ণকে নামিয়ে আনলেন।

আপন মনে ভাবভোলা হাসি হেসে ধীরে পদচারণায় আসছেন রামকৃষ্ণ। পরণে সরু লাল পাড় ধুতি—আদুর গা—পায়ে কালো রং এর চটি। কোঁচার খুঁটটি বামস্কন্ধে প্রলম্বিত। দেখে মনে হয় যেন সর্ব আবরণমুক্ত নিরাবরণ।

রামকৃষ্ণকে রোগা এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অত্যন্ত সাদামাটা বেশবাস—দেখাচ্ছেও সরল এক গাঁয়ের মানুষের মত। মুখে লেগে আছে স্বর্গীয় অনাবিল হাসি। সকলে তাঁকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল কিন্তু তাঁকে দেখে মনে করল তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষ। তেমন গুরুত্ব দিল না কেউ। ভাবখানা যেন ;—দেখা করতে এসেছেন ? ভাল কথা। বসুন।

আগন্তুক দু'জনকে সাধারণ দর্শকের আসন দেওয়া হ'ল। কেশবচন্দ্র কোনও কিছু বললেন না। নীরবে সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ব্রাহ্ম ভক্তদের কাছে এসে রামকৃষ্ণ হাতজোড় করে নতমস্তকে নমস্কার জানালেন। কেশবকে দেখছেন অপলক নয়নে। তাঁর দিকে কেশবচন্দ্রও নিস্পলক চেয়ে আছেন। আগন্তুক মানুষটির মমতা মাখান নয়ন দুটি কাছে থেকেও যেন কত দূরে দৃষ্টি ফেলে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দৃষ্টি কোমল অথচ গভীর। বারেক দৃষ্টিপাতে সেই চোখ ভেতর বাইরের সব কিছু পড়ে ফেলে। আর ওই ভুবন ভোলান হাসি ! কোন্ স্বর্গের অমৃত ঝরে পড়ছে ওই হাসিতে ? কি অপরূপ প্রেমঘন মূর্তি রামকৃষ্ণের ! কেশব মুগ্ধ হলেন তাঁকে দেখে। কোন আপনজন ঘরে এসে যেন আজ তাঁর নয়নে আলো ভরে দিল !

স্থির চোখে কেশব চেয়ে আছেন—চেয়ে চেয়ে দেখছেন রামকৃষ্ণকে। যোগী চক্ষু—কমনীয় কান্তি—প্রশস্ত ললাট। সমগ্র অবয়বে ঐজ্জ্বল্য আর চর্তুদিকে তাঁর শিষ্টতার শান্ত স্পর্শ। তিনি যে রামকৃষ্ণের আগমনকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়েছেন বাইরে থেকে তাঁকে দেখে তেমন মনে হ'ল না। তাছাড়া রামকৃষ্ণকে চেনা দূরের কথা তাঁর নামও অনেকে শোনেনি। রামকৃষ্ণ তখনও নিজেকে ঢেকে রেখেছেন—ভারতের অসংখ্য সাধুসন্তের মত একজন মাত্র আর অন্যপক্ষে কেশবচন্দ্রের তখন বিশ্বজুড়ে খ্যাতি ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত ও প্রগতিবাদি সংস্কারক হিসাবে। সেজন্যই তো কেশবচন্দ্রকে দেখতে এসেছেন রামকৃষ্ণ।

নীরবতা ভেঙ্গে রামকৃষ্ণই প্রথমে কথা বললেন। ঈষৎ জড়িয়ে যায় তাঁর কণ্ঠস্বর—শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে।

—"আচ্ছা বাবু! আপনাকে নাকি ঈশ্বর দেখা দেন? আপনি নাকি তাঁর প্রত্যাদেশ পান? একি সত্যি? তা কেমন সে ঈশ্বর? আপনার এই দর্শন কেমন তা জানতে আমি এসেছি?"—সরল সঙ্কোচহীন জিজ্ঞাসা।

কেশব তখনও তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে রামকৃষ্ণকেই দেখছেন। কত লোককেই তো ঈশ্বর সম্পর্কে কত কথা বলেন। বলতে বলতে ঈশ্বর প্রেমরসধারায় তাঁর নয়ন দুটি ভেসে যায়। রামকৃষ্ণও হয়ত এসেছেন তেমনি অনেকেরই মত একজন। তবু কেশব নীরব রইলেন কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎই যেন রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনিই বলুন ঈশ্বর কেমন।"—

মধুর হাসি হেসে রামকৃষ্ণ বললেন, "আমি আর কি বলব। মা বলায় আমি বলি, মা দেখায় আমি দেখি।" বলে উদাত্ত গলায় গান ধরলেন রামপ্রসাদী :—

কে জানে কালী কেমন ?
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রারে
সদা যোগী করে মনন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে
হংসীরূপে করেন রমন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম
অন্য কেবা জানে তেমন ॥
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝেনা
ধরবে শশী হয়ে বামন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু তরণ।"

—কালী কেমন কে তা বলতে পারে? ষড়দর্শনও তার দর্শন পায় না। যোগী তাঁকে মনন করেন মূলাধারে সহস্রারে। ইচ্ছাময়ী মায়ের যেমন ইচ্ছা তেমন তাঁর রূপ গ্রহণ। বিভিন্ন রূপে ঘটে ঘটে তিনি বিরাজিতা। তিনি যাকে চেনান সে তাঁকে চেনে, তিনি যাকে জানান সেই তাঁকে জানে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়ীর উদরে। মহাকালের বুকে তাঁর লীলা। একমাত্র মহাকালই তাঁর মর্ম জানেন।

গান শেষ হতেই ভাব-বিহ্বল হয়ে রামকৃষ্ণ সমাধি মগ্ন হলেন। আর যাঁরা তন্ময় হয়ে গানের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন তাঁদের কি অবস্থা হল? গানের ভাবে ও সুরে সকলেই কেমন যেন মুগ্ধ মৌন হয়ে গেছেন। মামার কানের কাছে মুখ এনে হৃদয়

প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন ও অন্যান্যদেরও সেই কাজ করার জন্য অনুরোধ করলেন।

সমাধিমগ্ন রামকৃষ্ণের নয়ন কোণে আনন্দাশ্রু দেখা গেল। মাঝে মাঝে তিনি হেসে উঠছেন। ক্রমে চেতনা লাভ করে চোখ মেললেন।

ব্যাপারটা কিন্তু ব্রাহ্মভক্ত কারও মনে তেমন রেখাপাত করল না, যদিও গান শুনে সকলেই মোহিত। সঙ্গীত যেন কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ভাবলেন হয়তো রামকৃষ্ণের ফিটের ব্যামো আছে অথবা মৃগী রোগী।

ক্ষণপরেই কিন্তু ভুল ভাঙ্গল সকলের। হতবাক হ'য়েছে সবাই। আশ্চর্য আনন্দে বিহ্বল! অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর আধ্যাত্মিক কথা বলছেন তো মানুষটি! অভূতপূর্ব! অনাস্বাদিত। এমনটি তো কই আগে শোনা যায়নি! এমন করে তো কেউ বলেনি! এত সহজ করে তো কেউ জানায়নি! সবাই রামকৃষ্ণের মুখের পানে চেয়ে আছে—অপূর্ব জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল!

ছোট ছোট আটপৌরে কথা কিন্তু কত গভীর তার মানে। আর উপমার কি বাহার! কি ঐশ্বর্য!

কেশব এখনও স্মিতমুখে নীরব। একাগ্রচিত্ত হয়ে আনন্দময় রামকৃষ্ণকে দেখছেন। বেশ বুঝতে পারছেন যে এই মানুষটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের একজন। বড় চেনা লাগে, যেন আপন জন। আর ওই যে গান গাইলেন, মন হরণ করে নিলেন।

উন্মুখ হয়ে সকলে রামকৃষ্ণের মুখনিসৃত কথাগুলি শুনছে। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "লুচি গরম ঘিতে পড়লে প্রথম প্রথম কাঁচা অবস্থায় শব্দ করে—লাফায়। কিন্তু যেই একটু ভাজা ভাজা হয় তখন আর শব্দ নেই। লুচি তখন তপ্ত ঘিতে ভাজা হয়ে পেকে গেছে। তেমনি যেখানে অল্প জ্ঞান সেখানে কেবল দেখানো। জ্ঞান যখন পেকে গেল, গভীর হ'ল তখন আর লোক দেখানো আড়ম্বর নেই।"—

কেশবচন্দ্রের আয়ত নয়ন দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণের কথা মনে হয় তাঁকে আনন্দ দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, "বানরছানা দেখেছ মার বুক লেপ্‌টে থাকে। বেড়ালছানা তার মার পিছে মিঁউ মিঁউ করে ছোটে। প্রথমটি হ'ল নির্ভরতা আর দ্বিতীয়টি হ'ল প্রার্থনা।"—

বানরশিশুর মতই নিশ্চিন্ত নির্ভরতা দরকার মানুষের—না হ'লে সংসার সমুদ্রে পড়ে সে হাবুডুবু খাবে। সেই নিশ্চিন্ত নির্ভয় নির্ভরতা হ'ল নিজ অহংকার ভুলে ঈশ্বরে নিমগ্ন হওয়া। জগৎ-জননীর কোলে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। মা সব ভার নেবেন, সব দেখবেন। তিনি মা—জগৎ-জননী, সন্তানকে কি দূরে রাখতে পারেন? বানরশিশু তার জননীর বুকে পরমনিশ্চন্তে লগ্ন হয়ে থাকে। তার কোনও ভাবনা নেই—যা করার বানরী-মা ঠিক ঠিক তা সবই করবে।

জগৎ-জননীর প্রতি এই বানর-শিশুর মতই নির্ভরশীল হ'তে হবে। তিনি যে জনম-জীবন-মরণ বিধাত্রী।

আর বিড়ালছানা?—সে মিঁউ মিঁউ শব্দ করে তার বিড়ালিনী মার পিছে দৌড়ায়।

অমন কাতরভাবে ক্রমাগত মিঁউ মিঁউ করে পিছু আঁকড়ে না থাকলে মা-বিড়াল যে স্তন দেবে না—দুধ খাওয়াবে না। 'মিঁউ মিঁউ' করতে করতে বেড়াল বাচ্চাগুলো বেড়াল মার পেছন পেছন দৌড়ায়, কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। বিরক্ত হয়ে মা বেড়াল তখন তার বাচ্চাদের মাই দেয় :—নে দুধ খা, খেয়ে চুপ কর, শান্ত হ। তেমনই জগৎ-জননীর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানালে মা ঠিক ঠিক তা পূরণ করেন।

কি সুন্দর কথা ! মনোহর উপমা ! রামকৃষ্ণের কথায় মুগ্ধ হ'ল সকলে। মন আরও শুনতে চায়। রামকৃষ্ণ থেমে থেমে কথা বলছেন। কখনও সম্বোধন করছেন 'আপনি' কখনও বা 'তুমি' বলে। ক্ষণে ক্ষণে কেশবচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। একসময় তাঁকে দেখিয়ে মৃদু হেসে বললেন,—

"এ'র ল্যাজ খসেছে।"

কানে লাগার মত কথা। শ্রোত্রীমণ্ডলী সোজা হয়ে বসলেন। অনেকের মুখমণ্ডল থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হ'ল। কেশব হস্ত উত্তোলন করে সকলকে শান্ত হ'তে অনুরোধ করলেন। হয়ত বলতে চাইলেন 'নিশ্চয়ই এই কথার কোনও অন্তর্নিহিত মানে আছে', এ'কে বলতে দাও।

মধুর হাসি হেসে রামকৃষ্ণ তাঁর কথার ব্যাখ্যা করলেন।

"বেঙাচির ল্যাজ যতদিন না খসে পড়ে ততদিন সে কেবল জলে থাকতে পারে বা থাকে। যখন তার ল্যাজ খসে যায়, সে তখন জলেও সাঁতরাতে পারে ডাঙ্গাতেও লাফাতে পারে। তেমনই মানুষ যতদিন অবিদ্যা-রূপ ল্যাজ নিয়ে থাকে ততদিন সে সংসার জলেই থাকে। ঐ ল্যাজ খসে পড়লে সংসার ও সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়ই সে ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারে। কেশবের মোহমুক্তি ঘটেছে। উনি সংসারে আছেন কিন্তু কর্তব্য-কর্মে উদাসীন হয়ে নয়, আবার সংসারের মধ্যে থেকেও সচ্চিদানন্দে তন্ময় হতে পারেন।" কথাগুলি বলে পুনরায় মৃদু মধুর হেসে উঠলেন—অপার্থিব সেই হাসিতে যেন বললেন, "ল্যাজ খসেছে শুনেই তো সবাই মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছিলে মনে হয়েছিল। তা দেখ, ব্যঙ্গ ছলে ওঁর স্তুতিই করলাম গো।" ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ খুলে গিয়ে শ্বেতমুক্তার মত কটি দাঁত পরিদৃশ্যমান হচ্ছে—অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে।

মনের কালো মেঘ কেটে গেল। রামকৃষ্ণের কথায় সকলে আনন্দ পেল। ভারি সুন্দর কথা বলেন ত ইনি ! এরূপ আরও কত কথা হ'ল। রামকৃষ্ণই মুখ্য বক্তা হিসাবে কথা বলছেন। কেশব নীরবে শুনছেন আর লক্ষ্য করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণকে। কখনও মৃদু মৃদু হাসছেন। ভাল লাগার হাসি।

স্নানাহারের বেলা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, উপাসনার সময় এসে উপস্থিত তবু কারও হু'শ নেই। এমনই তন্ময় হয়ে গেছেন সবাই রামকৃষ্ণের কথা শুনে।

হাসি-আনন্দে উপভোগ্য ঈশ্বর-কথায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। এবার রামকৃষ্ণ ফিরে যাবেন। ফিরে যাবার মুখে উঠে দাঁড়িয়ে মধুর উপমায় সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—"যখন গরুর পালে অন্য প্রাণী এসে ঢুকে পড়ে তখন সব কটি গরু মিলে তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে বের করে দিতে যায় ; কিন্তু প্রাণীটি যদি গরু হয় তো তখন তারা প্রথম ওর গায়ের গন্ধ শুকবে আর যখন তাদের স্বগোত্র বলে বুঝতে পারবে তখন

পরস্পরের গা চাটবে। ঠিক তেমনই ঈশ্বর ভক্তরা পরিচিত হ'লে পরস্পরের গা চাটে মানে ভাব পাতায়। আমাদের আজ যেমন হয়েছে।"—

রামকৃষ্ণের মধুর হাসিতে অন্যরাও যোগ দিল আনন্দে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নমস্কার করে তিনি গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বর ফিরে গেলেন। খুশীতে ভরপুর হয়ে বিস্মিত কেশবচন্দ্র সেই পথের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেক দিনের চেনা মানুষ যেন মনকে ব্যাকুল করে নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

রামকৃষ্ণের মধ্যে কেশব দেখলেন অসীম জ্ঞান ও গভীর ভক্তির অপূর্ব মিলন।

# ২

রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র—একজন পরমপুরুষ অন্যজন যুগপুরুষ। দু'জনার মতধারায় প্রচুর পার্থক্য আবার প্রগাঢ় মিল। অনির্বচনীয় সেই সুরের কাঁপন দু'জনারই প্রাণ বীণার তারে। তাই প্রথম দেখা ও আলাপেই উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীর আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলেন। মনে মনে দুজনেই দুজনার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। প্রথম দিনের আলাপ আলোচনার পর থেকেই রামকৃষ্ণকে কেশবের খুব ভাল লেগেছে। শুধু ভাল লাগা নয় তাঁকে অভিনবত মনে হয়েছে। সম্মুখে পশ্চাতে কত বাধা, কত ঝঞ্ঝাট,—কত হিংসা, বিরূপতা এবং সমালোচনা। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক নির্ভীক কেশবচন্দ্রকে সব কিছু ঠেলে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে মন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘরের মানুষ মনের মানুষের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোথায় পাবেন কেশব তাঁর আপন জনকে? রামকৃষ্ণের মধ্যে কি তাঁর দেখা পেলেন?

ওদিকে রামকৃষ্ণও কেশবকে দেখা মাত্রই নিজের ঘরের লোক বলে চিনেছেন। তাঁকে ভালও বেসে ফেলেছেন।

গভীরভাবে রামকৃষ্ণের কথা ভাবতেন কেশব। অপূর্ব ওই মানুষটির মধ্যে কত ঐশ্বর্য, কত গভীর জ্ঞান। ঈশ্বরের সঙ্গে কি নিবিড় সান্নিধ্য! ঈশ্বর যোগে সদা যুক্ত; ঈশ্বর ভাবে ভাবিত। এরূপ মানুষ যে সকলের দ্রষ্টব্য, সবাকার গ্রহণীয়—সর্বজনের বরণীয়।

ব্রাহ্মসমাজের তথা সে যুগের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ইণ্ডিয়ান মিররে (রবিবার, ২৮-৩-১৮৭৫) কেশব লিখলেন,—"We met long ago Paramhansa of Dakshineswar and were charmed by the depth of penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati; the former is being so gentle, tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical". [Indian Mirror, 28th March, 1875]

রামকৃষ্ণের বিস্ময়ভরা সারল্য, মাখন-পেলব কোমলতা, অমৃতসরস ঈশ্বরভক্তি, তামস-হরা জ্ঞানালোকের পরিচয় পেয়ে কেশবচন্দ্র বিমুগ্ধ হয়ে আছেন। কাগজে তারই কথা বলে রামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে দেখবার জন্য মানুষকে আহ্বান করলেন।[১] এস, দেখ এই অভিনব ঈশ্বরভক্ত মানুষটিকে। দেখে তৃপ্ত হও, ধন্য হও—এ আলোকে মোচন কর তোমাদের ঘরের অন্ধকার।

১ এর পরও দেখা যায় ইণ্ডিয়ান মিরর, সুলভ সমাচার, সানডে মিরর, থিইস্টিক, কোয়ার্টারলি রিভিয়ু প্রভৃতি সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখে কেশবচন্দ্র বহু লোককে দক্ষিণেশ্বরে টেনে এনেছেন।

রামকৃষ্ণের মধ্যে কেশব সেন তাঁর মনের মানুষ খুঁজে পেলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, সে আলোক তাঁর জীবনে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠ্ছে, যে আলোকের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল, রামকৃষ্ণের সে আলোক লাভ হয়েছে। শুধু লাভ হওয়া নয়, সে আলোকের জ্যোতিতে তিনি অন্যকেও আলোকিত করতে পারেন। ঐ সুন্দর মানুষটির কাছে সুন্দরতর আরও কত কিছু হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে একটু বাজিয়ে দেখতে চান কেশব রামকৃষ্ণকে। তিনি ওঁকে পরীক্ষা করে বুঝতে চান যে মানুষটি কতখানি খাঁটি—নিখাদ সোনা কিনা। কেশবচন্দ্র চির সত্যানুসন্ধানী—প্রমাণ নিয়ে সংশয় মুক্ত হতে চান।

অনুগত প্রসন্ন সেন ও আরও দুজনকে এ ব্যাপারে নিযুক্ত করলেন কেশবচন্দ্র। তাঁদের বললেন, "তোমরা দক্ষিণেশ্বর গিয়ে কালীবাড়িতে থাকবে। পরমহংসদেবের কাজকর্ম, তাঁর ভাবগতিক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবে। কিন্তু তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করবো না। যাও তোমরা, যতদূর সম্ভব পরমহংসকে লক্ষ্য রেখো।"

ব্রাহ্মভক্ত তিনজন কেশবের নির্দেশ মত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে এসে পৌছুলেন। মানুষটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে হবে কেশব যেমনটি বলে দিয়েছেন। ওরা দেখবেন—

রামকৃষ্ণের মধ্যে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি রয়েছে কিনা, মনে মুখে তিনি এক কিনা। কত গভীর তাঁর ভগবৎ ভক্তি। সত্যই কি তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী ?

দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রসন্নরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। "আমরা আচার্য কেশবের কাছ থেকে আসছি। এখানে দু'এক দিন থাকব।"

"বেশত থাক না যতদিন খুশী—তোমরা কেশবের লোক।" সরল হাসিতে রামকৃষ্ণ সম্মতি জানালেন।

প্রসন্নরা সারাদিনমান রামকৃষ্ণের কাছে কাছেই রইলেন—তাঁকে লক্ষ্য করে চললেন।

অনন্ত ভাবের ভাবী রামকৃষ্ণ। সর্বদা ভাবে বিভোর। কখন হাসছেন, কখন আপন মনে যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, কখনও বা গান গাইছেন—"হর হর শিব শিব। রঘুপতি সীতাপতি রাম।" আবার দেখা যাচ্ছে কখন আনন্দ বিহ্বল হয়ে বলছেন, "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ।" কখনও ভাবমত্ত হয়ে হরিনাম করছেন। তাঁর দু'নয়ন বেয়ে ঝরছে প্রেম-আঁখিধারা।

রামকৃষ্ণ কখনও বা দণ্ডায়মান হয়ে 'কালী, কালী' বলে চিৎকার করে উঠছেন। মহিমা স্তব করছেন। কভু বা ব্যাকুল হয়ে "মা আমার, মা আমার—মাগো! কোথায় তুই ? দেখা দে মা,—মা—মাগো" বলে হাহাকার করে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছেন। আবার কিছু পরে হয়ত তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্থাণুবৎ সমাধিমগ্ন। সমাধি ভাঙ্গলে আবার আপন মনে হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠছেন। দিব্যোন্মাদ অবস্থা তাঁর। শিশুর মত স্বভাব। ঈশ্বর কথা ছাড়া মুখে আর কোনও কথা নেই।

প্রসন্ন ও তাঁর সাথীরা অবাক চোখে রামকৃষ্ণকে দেখছেন। আশ্চর্য মানুষ! প্রাণে কি অনির্বচনীয় ঈশ্বর-প্রেম!

রামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্ত অবস্থা ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা দেখে কেশব-অনুচরেরা মুগ্ধ হলেন। ঈশ্বর ভক্তিতে যে ওঁর কোন খাদ নেই এটা তাঁরা বেশ অনুভব করলেন কিন্তু

রামকৃষ্ণের দিব্য ভাবটিকে তাঁরা হয়তো পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। একজন অন্যজনকে আড়ালে বললেন, "কি গভীর ঈশ্বর ভক্তি এ'র দেখেছেন? তবে মনে হয় গুরুর অভাবে ইনি ঠিক পথ পাচ্ছেন না। ঠিকমত গুরু-উপদেশ লাভ হলে এ'র চতুর্বর্গ লাভ হতে পারে।"

কেশব-অনুচরেরা রামকৃষ্ণকে পরামর্শ দিলেন, "আমাদের আচার্য কেশবের শরণ নিন আপনি। আপনার চতুর্বর্গ লাভ হবে।"

কথা শুনে রামকৃষ্ণ হাসলেন। এ অজ্ঞানতার কি উত্তর আছে? একটা গান গেয়ে ওদের বোঝাতে চাইলেন,—

"আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি একি ফল নিয়ে!
পেয়েছি যে ফল জনম সফল
রামকল্পতরু হৃদয়ে রোপিয়ে।
শ্রীরাম কল্পতরু বৃক্ষমূলে রই,
যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই।
শুন ফলের কথা কই, ওফল গ্রাহক নই।
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।"[১]

গানের মানে ওঁরা কেমন বুঝলেন তা তাঁরাই জানেন।

ক্রমে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামল। খাওয়া দাওয়া সেরে প্রসন্ন এবং অন্য দু'জন রামকৃষ্ণের ঘরে এলেন।—"আমরা এখানেই শোবার জোগাড় করি তাহ'লে"—বিনীত ভাবে প্রসন্ন বললেন।

'বেশ থাক'—রামকৃষ্ণ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

রাত্রি বেশ গভীর হয়েছে। মনে মনে ভবতারিনীর চরণ ধ্যান করছেন রামকৃষ্ণ। জগন্মাতার পদ-পঙ্কজে লীন হয়ে নিদ্রামগ্ন হবার চেষ্টা করছেন এমন সময় গভীর রাতে "দয়াময়, দয়াময়" মিলিত কণ্ঠের এই প্রার্থণায় চমকে উঠলেন।

কি ব্যাপার?

ব্রাহ্মভক্তরা উপাসনা করছে।

তা কর না উপাসনা যেমন মন চায়। সমস্ত হৃদয় ঢেলে তাঁকে ডাক। জীবনের উদ্দেশ্যটাই তো তাই।

কিন্তু তাই বলে কি এই গভীর যামিনীতে সকলের নিদ্রায় ব্যাঘাত এনে তাঁকে ডাকতে হবে? আর শুধু 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে চেঁচিয়ে কেন তাঁকে ডাকা বাপু। এ ডাকে তো কেবল ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে বর্ণনা করা। এ ডাক যেন তাঁকে দুরে রেখে ডাকা—কাছে গিয়ে ডাকা নয়, কাছে টানার ডাক নয়।

১ শ্রীঅক্ষয় সেন লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি"; পৃঃ ২২১-২২৩ ৩য় সংস্করণ

রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের উপাসনায় আরও একটু মন দিলেন। 'উঁ হুঁ' হৃদয় ঢেলে তো ভগবানকে ডাকছে না ওরা! এতে প্রাণের স্পর্শ কই তেমন? আরও প্রাণ ঢালো— মন গলাও তবে না!

শুধু 'দয়াময়' 'দয়াময়' নয় ঘরের মধ্যে কেশব অনুচরেরা পরস্পর অন্য কথাও কইছেন দেখা গেল। ওরা সমানে লক্ষ্য করছেন রামকৃষ্ণকে। অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। ক্রমে ব্রাহ্মভক্তরা রামকৃষ্ণের কানে কেশবের স্তুতি আরম্ভ করলেন;—আচার্য কেশব অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। কেশব হেনো, কেশব তেনো। রামকৃষ্ণ যদি কেশবের শরণ নেন তাহলে তিনি সঠিক পথ পাবেন।

হায় অন্ধ! যেন কেশবকে রামকৃষ্ণের চেয়েও এরা ভাল চেনে। কেশব অনুচরদের কথাবার্তা শুনে মমতামাখা চোখে তাঁদের দিকে চেয়ে মৃদু মধুর হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ; শিশুর সারল্যে বললেন, "আমি যে আমার ভুবন মোহিনী মার ছেলে হয়ে থাকতে চাই গো। এই দু'নয়নে মাকে ভরে রাখতে চাই। আমার ওসব পোষাবে না বাপু।"

এই কথা কটি বলে উদাত্ত গলায় কমলাকান্তের একখানি গান গেয়ে উঠলেন তিনি। ঐ গানে আছে জগজ্জননীর ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপের আলপনা আঁকা।

"সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়
দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে
রণ প্রকাশে রঙ্গিনী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু
ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু
মলিন, এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
পদতলে শব সদৃশ-নীরব
কমলাকান্ত কর অনুভব
কে বটে ও গজগামিনী॥"

গান শেষ করে হাসিমাখা মুখে তিনি কেশব-ভক্তদের দিকে চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর দুই নয়ন দিয়ে প্রেমের আলো ঝরে পড়ছে। ব্রাহ্মভক্তরা তাঁর জ্যোতির্ময় মুখপানে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু তবু তাঁদের কণ্ঠে 'দয়াময়' ডাকের বিরতি নেই।

রামকৃষ্ণ ভাবলেন কি আর করা যাবে, ওরা অতিথি, নিদ্রার ব্যাঘাত হলেও যো সো করে কানে তুলো গুঁজে রাতটা না হয় কাটিয়ে দেবেন।

রাতের প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় কিন্তু অভিনয়ের একই অঙ্ক—উচ্চরোলে 'দয়াময়' 'দয়াময়' চিৎকার। কি আপদ! মনে মনে বিরক্ত হলেন রামকৃষ্ণ এবার। জগদম্বাকে জানালেন, "এই লোকেরা বড় গোল করছে। ঘুমুতে দেয় না। এদের এখান থেকে নিয়ে যাও।"

তাই হ'ল,—রামকৃষ্ণের ভাবগতিক দেখে কেশব-অনুচরেরা চুপ করলেন। কেমন যেন ভয় পেয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় সবাই চলে এলেন।

আচার্য কেশবের কাছে গিয়ে অনুচরেরা রামকৃষ্ণের বিষয় সব কিছু জানালেন যা তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখে শুনে এসেছেন। কেশব বিমুগ্ধ হয়ে সব কথা শুনলেন।

৩

অনুচরদের মুখ থেকে সব কিছু শুনে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার জন্যে কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওঁদের কথা শুনে বুঝেছেন পরমহংসদেবের ঈশ্বর ভক্তি কত গভীর! তার আঁচ তাঁর হৃদয়েও এসে লেগেছে।

তাই কেশব রামকৃষ্ণকে দেখতে একদিন দক্ষিণেশ্বর এলেন। সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত।

কেশবচন্দ্রকে দেখে রামকৃষ্ণের মনে আনন্দ যেন ধরে না। ভেবে পাচ্ছেন না কি করবেন।

"হে—হে আপনি এসেছেন! আমি কতদিন পথ চেয়ে বসে,"—খুশীর হাসি হেসে তিনি কেশবকে অভ্যর্থনা জানালেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সকলকে। কেশবচন্দ্র মাথা নুইয়ে জোড় করে নমস্কার জানালেন। তাঁর হাতে মিষ্টি। রামকৃষ্ণের জন্য এনেছেন।

রামকৃষ্ণ আনন্দে তাই একটু খেলেন। মাঝে মাঝে তিনি "মা আমার আনন্দময়ী; মা আমার রঙ্গময়ী" এই কথা বলছেন।

প্রফুল্ল মনে রামকৃষ্ণকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন কেশব সেন। নীরবে বসে আছেন তাঁর সামনে—আশে পাশে অন্যরা বসেছেন। সকলে ওঁর জ্যোতির্ময় মুখপানে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। ওঁর ওষ্ঠ প্রান্তে ব্যথা ভোলানো সেই অপার্থিব হাসি ফুটে আছে—যেন শারদ প্রাতে একরাশ ঝরা শেফালি! মনকে বড় টানে ওই হাসি।

কেশবের দিকে চেয়ে অনুরাগ-ছোঁওয়া গলায় রামকৃষ্ণ বললেন, "ওগো, আপনারা আমার মাকে দেখবেন না? ওই মন্দির ঘরে আমার মা রয়েছেন গো, ভুবনমোহিনী মা। আমার মাকে প্রণাম করবেন না? মা যে সকলের মা।"

ব্রাহ্মদের রীতিনীতি রামকৃষ্ণের জানা আছে। জানা আছে এদের ধর্মীয় মত-অমত। নিরাকার ঈশ্বর-ভাবনার অহংকারে এরা না বুঝে সাকার পূজাকে পৌত্তলিকতা বলে মুখ ঘোরায়।

রামকৃষ্ণের অগোচর কিছু নেই। কিন্তু এই জানাটাই তো সব নয়,—এদের ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। এরা নিজের ঘরের লোক বৈ আর কে? মার কাজ, তিনিই করাবেন।

নম্রকণ্ঠে রামকৃষ্ণের কথার উত্তর দেন কেশবচন্দ্র, "আমরা ব্রাহ্ম, নিরাকার ঈশ্বর মানি। দেবদেবী দর্শন করি না।"—

"সেকি ভুবনমোহিনী আমার মাকে আপনারা মানেন না! তা প্রণাম না করেন মাকে একবার দর্শন করে আসুন। মা খুশী হবে।" তারপর কেশবের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন,—"আপনাকে মা যে ভালবাসে গো।"—রামকৃষ্ণের শেষের এই কথায় কেশব অঙ্গে শিহরন অনুভব করলেন। "আপনাকে মা যে ভালবাসে গো," কথাটা এখনও কানে বাজছে তাঁর। কেশব তো এই ভালবাসা পাওয়ার জন্যই ব্যাকুল।

—"যে একবার মা কে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে"—কেশব কি তাঁর সেই মাকে দেখবেন না ? ঈশ্বরকে পিতা বলে অনেক ডেকেছেন, এবার 'মা' ডাকে কি ডাকবেন না ? রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "ওই মৃন্ময়ী কালিকামূর্তিই কি আপনার মা, ঈশ্বরের মাতৃরূপ ?"—

"একি কথা গো ! মা আমার মৃণ্ময়ী হবে কেন শুধু। মা যে আমার চিণ্ময়ীও। আর মায়ের কি একটা রূপ ? তাঁর রূপের শেষ নেই। রূপে অরূপে মা যে আমার মহামায়া ! মা—মা—মা—মাগো—" বলেই রামকৃষ্ণ ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। নয়ন নিমীলিত করে অস্ফুটে আপন মনে কি যেন বলছেন। পরে চোখ মেলে কেশবের দিকে চাইলেন—দৃষ্টি তাঁর ভাসা ভাসা।

—"আপনার মা কেমন বলুন ?"—শান্তকণ্ঠে কেশবের জিজ্ঞাসা।

রামকৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার মা ? তিনি তো আপনারও মা। সকলের মা—জগজ্জননী। আপনি কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। অকূল সাগর দেখেছেন, মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ দেখেছেন। যে নয়নে এইসব দেখেছেন, সে নয়নে কি আমার আপনার মাকে দেখেন নি ? আপনার চোখ যে মাকে দেখার চোখ গো—যোগী চক্ষু।—"

"ব্রহ্মাণ্ড উদরা মা জগদ্ধাত্রী," ঈষৎ জড়িয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণের বাক্যসুধা,"তিনি ব্রহ্মময়ী সিদ্ধিদাত্রী শক্তি স্বরূপিণী। নির্গুণ নিরাকার হ'ল ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের স্বরূপই শক্তি। শক্তিতেই এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে—স্থিতির সম্বল শক্তি। শক্তিই ধারণা। এই শক্তিতেই ব্রহ্মের লীলার প্রকাশ। শক্তির দর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত। দর্পণস্বরূপ শক্তি সহায় না হলে ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে না। শক্তি বিরাট—মহাকালী সেই শক্তি স্বরূপা।"

গভীর মনোযোগে কেশব শক্তিতত্ত্ব শুনলেন। ইতিমধ্যে অভ্যাগতদের জন্য জলযোগের আয়োজন হয়েছে। মিষ্ট মুখ করতে করতে আনমনা কি ভাবছেন ব্রহ্মানন্দ কেশব। কি যেন ভেবে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, শক্তিময়ীর অবয়ব যদি বিরাট কেন তবে প্রতিমা আকারে তাঁকে দেখা ?"—

রামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, "ওই আকাশের সূর্য পৃথিবীর চেয়ে বহু বহুগুণে বড়, কিন্তু মানুষের চোখে থালার মত। তেমনি প্রতিমার মধ্যে বিরাটের স্থিতি। আকার দেখে ক্ষুদ্র ভাবা যায় না, বহু দূরের বলে ছোট মনে হয়।"

ক্ষণিক বিরতির পর মধুর হাসি হেসে আবার বললেন, "ব্রহ্মময়ী মা যেমন বিরাট, তেমন তিনি করুণাময়ী, বরাভয়দাত্রী।"[১]—

কথা শুনে কেশবের হৃদয়ে আনন্দ শিহরণ জাগল, কি যেন পাওয়ার জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন এক মন নিয়ে, ফিরে যাচ্ছেন অন্য এক মন নিয়ে। ভেতরে ভেতরে অনেক উলট-পালট হয়ে গেল।

কেশবচন্দ্র সেদিন মাতৃমূর্তি দর্শন করেন নি। রামকৃষ্ণ মনে মনে হেসেছেন। তাতে কি ? বাইরের চোখে মাকে নাইবা দেখলে, অন্তরের চোখ তিনি তো অনেকদিন আগেই খুলে দিয়েছেন। নিস্তারিণীর হাতে কেশবের নিস্তার নেই।[২]

---

১ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন লিখিত ( ৩য় সংস্করণ ) পৃঃ ২৩৩—২৩৫

২ এর পরেও দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্র যখন আসতেন তখন মন্দিরে দেবীমূর্তি দর্শন করেছিলেন বলে জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি দেবী দর্শন করেন নি। তবে তাঁকে জগন্মাতা কালী অন্তরে দেখা দিয়েছিলেন। নিরাকারও যে মার একরূপ এক আকার।

## ৪

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কথা প্রচার করলেন। শিক্ষিত সমাজ সেকথা পড়ে কৌতূহলী হ'ল। তাঁকে দেখতে এল। রামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

কে যেন এসে বলল, "কেশব সেন কাগজে আপনার বিষয় ছাপিয়েছেন।"

"ছাপিয়েছে? একি! এসব ছাপান কেন? আমি খাই, দাই, থাকি, আর কিছু জানিনা। আমার নাম ছাপান কেন বাপু?"—মৃদু অসন্তোষ ঝরে পড়ে রামকৃষ্ণের কণ্ঠে।

কেশবচন্দ্রকে দেখা হ'লে বললেন, "তোমার কাগজে আমার নাম ছাপালে কেন গা?"—

"আপনার কাছে লোক আসবে ব'লে,"—কেশবের নিঃশঙ্ক উত্তর।

এখন পরিচয়ে নিবিড়তা, সম্পর্কে আত্মীয়তা এসেছে। রামকৃষ্ণ কেশবকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত মণ্ডলীর সঙ্গে নগর সংকীর্তনে বা প্রচার যাত্রায় বেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এলেই কেশব রামকৃষ্ণের কাছে ছুটে আসেন। কখনও বা সোজা তাঁকে দেখতে চলে আসেন। জাহাজে ব্রহ্মনাম কীর্তন করে ভ্রমণের সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণকে তুলে নেন বা সদলে এখানে এসে তাঁর কাছে বসে কথামৃত শোনেন। কেশব যখনই তাঁকে দর্শন করতে আসেন তখন তাঁর জন্য ফল বা মিষ্টি কিছু না কিছু নিয়ে আসেন।[১]

কত বড় জ্ঞানী, গুণী এই মানুষটি। বিশ্বজুড়ে নাম। মনে কিন্তু একটুও অহংকার নেই, নিজের কথা বলার চেষ্টা নেই, ভিন্ন মতধারার সাধক হয়েও কোনরকম বিতর্কের চেষ্টা বা আগ্রহহীনতার ভার নেই মনে—শান্ত, সমাহিত এবং বিনীত। এমন মানুষ ব্রহ্মানন্দ কেশব না হ'লে আর কে হবে? যে সত্য তিনি বুঝেছেন তাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবার কি আগ্রহ তাঁর।[২] রামকৃষ্ণকে বোঝবার জন্য কি অসীম উৎসাহ। জানা-অজানা কত কথা আশ্চর্য সুন্দরভাবে রামকৃষ্ণ বলেন। সত্য সূর্যের স্বর্ণকিরণ যেন নতুন করে পাওয়া। রামকৃষ্ণ যেন কেশবচন্দ্রকে সম্মোহিত করেছেন।

এখন ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব চলছে। এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে কেশব রামকৃষ্ণের

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (২য় ভাগ)—স্বামী সারদানন্দ।

২ "Universal and natural truth is common to all. All truth is God's truth and therefore common to us all, as coming from our common property, and we are privileged by birth right to use it, where ever it may be found." [Lectures in India, Vol II, P 161 by Keshab Ch. Sen]

কাছে দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছেন। সঙ্গে আছেন ভাই প্রতাপচন্দ্র, ত্রৈলোক্য ও আরও অনেকে।

কেশবদের দেখে রামকৃষ্ণ খুব আনন্দিত হলেন। তিনি সকলকে বসতে বললেন। কেশবকে তাঁর খুব কাছে বসালেন। দুটি হাত দিয়ে ওঁর দুটি হাত ধরলেন। ইষৎ অভিমান নিয়ে বললেন, "কেশব! এখানে তোমার আসতে বড় দেরি হয়। আমি আশা নিয়ে বসে থাকি। তোমার কত কাজ—এখানে লেকচার সেখানে সভা, তার ওপর কাগজে লেখালেখি। আমার কাছে আসবেই বা কখন।"—কথাগুলির ওপর অন্তরঙ্গতার মসৃণ প্রলেপ।

কেশব হেসে বললেন, "এই তো এলাম আপনার মুখে ঈশ্বর-কথা শুনতে।"

"আমি আর কি বলব? মা যা বলায় তাই বলি"—ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ কথাগুলি বললেন, একটু যেন অন্যমনস্ক ভাব।

কেশব বললেন, "আপনি কিছু বলুন, আমরা শুনি।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে রামকৃষ্ণ গান ধরলেন—

'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করি, পঙ্গুরে মা লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে করো অধোগামী।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী
আমি ঘর, তুমি ঘরণী
আমি রথ, তুমি রথী
যেমন চালাও তেমন চলি।—

গভীর চোখে রামকৃষ্ণকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন কেশব সেন। দেশবিদেশের কত জ্ঞানী গুণী মানুষের সঙ্গ লাভ করেছেন তিনি কিন্তু এমন মানুষ বুঝি দেখেন নি—ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন সরল কথাও শোনেন নি। আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঈশ্বরীয় ভাবের! জ্ঞান আর ভক্তিতে সেগুলি জারিত। কেশবের মনের কথার যেন সুন্দর প্রকাশ। বিনীত ছাত্রের মত এক একটি কথা মনে তিনি গেঁথে নেন। তিনি নিজেই তো এই সব বিষয়ে কত কথা বলেছেন, কত কি ভেবেছেন, জেনেছেনও অনেক কিছু। তবু বুঝি কেশব আরও কত শিখবেন। কিন্তু সাধারণ অর্থে কারও শিষ্য নন তিনি। ঈশ্বর ছাড়া কাউকে গুরু বলে মানেন না ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন। তাঁর জীবনের একটা উপলব্ধিই হ'ল শিষ্যত্ব। জীবন-পথে চলতে চলতে শিক্ষা করা। স্বরচিত "জীবন-বেদে" তাঁর মর্মবাণী শোনা যায়—

"এই পৃথিবী ব্রহ্ম বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিতে হইবে ধর্মোপার্জন ও জ্ঞান চর্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই। শিক্ষক বলিয়া কখনও আপনাকে বিশ্বাস করিব না। শিষ্য হইয়া আসিলাম শিষ্যের জীবন ধারণ করিয়া শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। শিখ ধর্মের প্রধান ধর্ম আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই ভাব হইতেই জীবন-তরু দিন দিন

সবল ও সতেজ হইতেছে। শিক্ষা করিয়াছি, শিক্ষা করিতেছি, প্রবল কামনা আছে চিরকালই শিক্ষা করিব।

প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে শিক্ষা করিয়া থাকি ; সম্পদে বিপদে ধর্মগ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ অধ্যয়ণ করি। প্রাণী মাত্রই আমার গুরু, বস্তু মাত্রই আমার শিক্ষক, মনুষ্য প্রকৃতির নিকটও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি।

*　　　　*　　　　*　　　　*

শিক্ষাই আমার ব্যবসায়, শিক্ষাতেই জীবন, সুখ শিক্ষাতে, পরিত্রাণ শিক্ষাতে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কখনও আমার মনে হইল না যে শিক্ষার শেষ হইয়াছে। কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখি গুরু, মৎস্য গুরু—সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। কর্তব্যবোধ যে ইহা করিয়াছি তাহা নহে, ধর্মানুরোধেও ইহা হয় নাই। ইহার জন্য স্বভাব উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই আমার সুখ হয়।

*　　　　*　　　　*　　　　*

শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে একথা কখনও মনে হয় নাই। যখন পড়িয়াছি তখন এ ভাব মনে হয় নাই ; যখন পড়াইয়াছি তখনও হয় নাই। যখন শিখিয়াছি তখন আমি শিষ্য, যখন শিখাইয়াছি তখনও আমি শিষ্য। পাঁচজনের সঙ্গে সাধন করিয়া তত্ত্ব সঞ্চয় করি, হৃদয়ের মধ্যে সত্য রত্ন পাইলেই আহ্লাদ হয়।"[১]

ব্রহ্মানন্দ কেশব নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। তবু ঈশ্বরের সাকার রূপকে মন থেকে কেন জানি একেবারে অস্বীকারও করতে পারেন না। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর সাকার রূপের মধ্যে ঈশ্বরের এক এক অভিব্যক্তি ধরা আছে বলে তাঁর মনে হয়। ঈশ্বরকে পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে অনুভব করে, তাঁর উপদেশে, ভাষণে ও প্রার্থণায় বহুবার ঈশ্বরবিষয়ক কত কথা বলেছেন। তাঁর ধ্যানোপলব্ধির মধ্যে বিশ্বের সর্ব ধর্মে একটা ঐক্যের দেখা পাচ্ছেন।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ মূর্তি-উপাসক হলেও প্রকৃত সাকার-নিরাকারে পারে তাঁর অবস্থান। কেশবের জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর মুখের বাণীতে।

কথার মাঝে কেশব বললেন, "সর্বক্ষণের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারি কই ? হয় কই ঈশ্বর দর্শন ?"—হতাশ বেদনা তাঁর কণ্ঠস্বরে।

মধুর কণ্ঠে রামকৃষ্ণ বললেন, "সবকিছু ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর নিজের কোলে তুলে নেবেন না। লোকমান্য, বিদ্যার অহংকার এসব তোমার কিছু না কিছু রয়েছে। এগুলিকে ত একেবারে ত্যাগ করনি। তাই সর্বদা যোগে যুক্ত থাকতে পার না। এই যেমন ছেলে চুসি নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসি। খানিকক্ষণ পরে চুসি ফেলে যখন চিৎকার করে, তখন মা ভাতের হাড়ি নামিয়ে আসে।"[২]

কথাটি বড় সুন্দর ! তোমার সকল অহংকার নয়নজলে ডুবিয়ে ঈশ্বর চরণে নিজেকে সমর্পণ কর, সেই সন্তাপহরণ ঠিকই তাঁর কাছে তোমায় টেনে নেবেন।

---

১ জীবন বেদ—শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ( পঞ্চদশ অধ্যায়—শিশু প্রকৃতি )

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ( ২য় ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ )

নীরবে ধীরে ধীরে শির সঞ্চালন করেন কেশবচন্দ্র। কথাগুলি কত সরস অথচ সতেজ তীক্ষ্ণ। জীবনের সঙ্গে জীবন-বিধাত্রীর সরল যোগের ইঙ্গিত। মানুষের তৃপ্তিদানকারী যেন এক অপূর্ব স্বর্গীয় অমৃত।

আশ্চর্য! এমন কথাই তো কেশব নিজেকে বারবার বোঝাতে চেয়েছেন।[১]

কেশবকে জগজ্জননী কালিকার কথা, পুরুষ-প্রকৃতির কথা বললেন রামকৃষ্ণ। শক্তি স্বরূপিণী জগৎ জননীর ইচ্ছাতেই জগৎ ক্রিয়াশীল। সবকিছু ঘটছে তাঁরই অভিলাষে। পুরুষ জড়, প্রকৃতি চেতন। পুরুষ শব, প্রকৃতি শক্তি। একই মূল বস্তুর দুই ভিন্ন রূপ। কত জটিল কথা কত সহজভাবে বললেন তিনি।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের আগেই কেশবের ভাবনায় ও ধ্যানে ঈশ্বরের মাতৃরূপ প্রমূর্ত হয়েছে। এ'র সঙ্গে পরিচয়ের পর সে উপলব্ধি আরও ঘনীভূত হচ্ছে।[২]

বেশ কিছুদিন আগে কেশবচন্দ্র তাঁর উপদেশে ঈশ্বরের মাতৃভাবের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

"মানুষের রূপগুণ দেখিয়াছ, কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য আজ উৎসবের দিনে তা দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভালরূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না?...এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে!"[৩]

ঈশ্বরের মাতৃভাবের ধারনা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই চালু ছিল। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে 'মা' বলে প্রথম বক্তৃতা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে, রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের এগারো-বারো বছর আগেই। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তাঁর ভাষণে আবার মাতৃনাম ধ্বনিত হয়েছিল;—

"Thus Brahmoism not only reveals God to me but He whom I worship is my father and mother and saviour."[৪]

তারপরও কেশবের দৈনিক উপাসনায় মাতৃভাবের ভাবনা দেখা যায়; রামকৃষ্ণের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয় নি। আচার্যের উপদেশে এ ভাবের আরও গভীরতা দেখা গিয়েছিল।

---

১ রামকৃষ্ণের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালেই যেন শতদলের মত ফুটে উঠেছিল।

২ পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ভক্ত কেউ কেউ এবং ব্রাহ্মসমাজের কোনও ব্যক্তি লিখেছেন যে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে ধারণা করার জ্ঞান কেশবকে রামকৃষ্ণই দেন। কথাটা ঠিক নয়, রামকৃষ্ণের ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা ও হরিনাম গান কেশবচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল ঠিকই কিন্তু যথার্থই রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের বহু পূর্ব হতেই তাঁর ভাবনায় ও ধ্যানে ঈশ্বরের মাতৃমূর্তি মূর্ত ছিল।

৩ "জগজ্জননীকে দেখ" আচার্য্যের উপদেশ, ২৫.১.১৮৭৫

৪ Lecture 'Brahmo Samaj vindicated' by K. C. Sen.

"মাকে যদি না দেখিলে তবে তোমরা মাতৃহীন। যাহার মা নাই, সে বরং আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে। যে জানে, মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না? কিন্তু যখন দেখিতেছি ঐ তোমাদের মা, তাঁহার আশীর্বাদ হস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কতদিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইঁহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না। তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখাপড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি, ব্রাহ্মকন্যা, যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়।[১]

অন্যান্য উপদেশাবলীর মাঝে কেশবচন্দ্র আরও গভীরভাবে জগজ্জননীর কথা বলেছেন দেখা যায়।—যেমন,

"No one's name is so dear, as the name of supreme Mother."[২]

জগন্মাতার প্রতি কেশবচন্দ্রের প্রাণের আকুতিও বড় মধুর।

—"প্রেমময়ি জননি, স্নেহের পিতামাতা, কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও। যে একবার তোমার দর্শন পায়, তাহার তো দুঃখ থাকে না। * * *

তাই ডাকিতেছি জননি, কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর। তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতঃ! ভাই, ভগ্নি সকলের জননি! এই আশা করিয়া তোমার চরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।"[৩]

কেশবের সেই জগজ্জননীর কথাই বলছেন রামকৃষ্ণ। সেই মায়ের কথা বিশেষ রূপে

১ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ "জগজ্জননীকে দেখ", ২৫-১-১৮৭৫

২ Acharya Upadesh Vol. III, p. 136, 5th May, 1872

৩ "মাকে দেখিয়া সুখী"—ভারতাশ্রম ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে, আচার্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ; ২৫-১-১৮৭৫

রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের আগে ও পরে ঈশ্বরকে জগজ্জননী জ্ঞানে কেশব যে কত ধারণা ও ভাবনা করেছেন তার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। আশ্চর্য হতে হয় কেশবদর্শনে ঈশ্বরের মাতৃভাবের ক্রম-অভিব্যক্তি দেখে. তাঁর "মাকে দেখিয়া সুখী", "জগজ্জননীকে দেখ"; "বাগদেবী", "লক্ষ্মীশ্রী", "আমার মা সত্য কিনা", "মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী দেবী" প্রভৃতি ভাব-চিন্তাগুলি আশ্চর্য সুন্দর। প্রেমময় রামকৃষ্ণের ছোঁয়া লেগে যদি কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরের মাতৃরূপের ভাবনা সুন্দরতর হয়ে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে গভীর আনন্দের বিষয়।

যিনি রূপে অ-রূপে মহামায়া। "মা আমার আনন্দময়ী" এ কথা ভাবতেই প্রাণ ভরে ওঠে।

রামকৃষ্ণের কথা শুনে ঈশ্বরের মাতৃরূপ কেশবের মনে যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। তিনি হিন্দুধর্মের বিশালত্ব যেন আরও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন। হিন্দু-ধর্মের অপূর্ব ভাবগুলি কেশবকে মুগ্ধ করল, তাঁর এ দিকের রুদ্ধ দুয়ার রামকৃষ্ণই খুলে দিলেন।[১]

১ রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কেশব সানডে মিররে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—
"Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as there." (Sunday Mirror, 28.3.1875)

৫

ভালবাসার দোলায় কেশবের হৃদয় দোলে। সত্য, প্রেম আর সরলতা, এগুলি অবলম্বন না করলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়—একথা তিনি প্রায়ই বলে থাকেন। সত্য ও সরলতার যোগের পথ প্রেম। এই প্রেমের জন্য কেশবের প্রাণ কাঁদে, প্রেমে পাগল হ'তে সাধ যায়।

রামকৃষ্ণেরও প্রাণ কাঁদে। তিনি তো প্রেম-পাগল। ভাবোন্মাদ। আত্মপ্রেমের সীমানাতেই ধরা দেয় বিশ্ব-প্রেম। বিশ্বপ্রেমে আত্মপ্রেম হারিয়ে যায়। নিজের বুকে যখন প্রেম জাগে তখন জগৎ সংসার সবই একান্ত আপনার। এই সত্য কেশব আরও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন একদিন রামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে কেশবচন্দ্র দেখলেন মার নাম-গান করে রামকৃষ্ণ ভাব-বিহ্বল হয়ে আছেন—প্রায় বাহ্য-জ্ঞান হীন অবস্থা। ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছেন আর ভাবের আঁখিমেলে কি যেন দেখছেন চারিদিকে।

কেশবকে দেখে রামকৃষ্ণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতখানি ধরে নিজের কাছে বসালেন। ভাবচোখে দূরের পানে চেয়ে রইলেন কিছু সময়, পরে কেশবের দিকে চেয়ে হাসি মুখে বললেন, "জগজ্জননী শ্যামা সমস্ত জগৎ ব্যাপৃতা। তিনিই জগৎ আবার তিনিই জগৎ বিধাত্রী। জগতের মূল সত্য প্রেমের মধ্যেই ধরা আছে। প্রেমই হল সব। ভালবাসায় ভগবান বাঁধা। গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা ছিলেন। প্রেমের কাজল চোখে মাখলে সহজেই বিশ্বজননীর স্বরূপ বুঝতে পারবে।"

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, "প্রেম নির্মল ও স্পষ্ট। আত্মপ্রেম থেকেই বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি। উভয়ে কার্যতঃ একই। বিশ্বপ্রেমের অনুভবে ছোট বড়, লঘু-গুরু পাপ-পুণ্য হলাহল-অমৃত, শূণ্য-পূর্ণ সবই সমান। যে শিব সেই জীব। জড় ও চেতন উভয়ই বিশ্ব-প্রেমের রসসমুদ্রে ভাসছে।"

"জগতই শক্তিস্বরূপা কালী আর তিনিই জগৎ। অণু-পরমাণু সবই মা ময়……"

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। কেশব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে রামকৃষ্ণ কেমন বিবশ হয়ে যাচ্ছেন—শরীরটা তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাঁর সমগ্র অঙ্গই যেন প্রেমময় হয়ে গলে গলে পড়ছে। এর পরই হঠাৎ যেন কঠিন এক যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে চিৎকার করে ককিয়ে উঠলেন—

"ও হো মাকে কাটছে, ওগো মার অঙ্গে আঘাত করছে—মা—মা—মা—"

শ্রাবণ ধারা নেমেছে তাঁর দু'নয়নে। যন্ত্রণায় বিকল প্রাণের কান্না আর থামে না—

"ওগো মাকে যে কাটছে—মাকে কাটছে!" আকুল হয়ে অশ্রুপাত করতে করতে গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন রামকৃষ্ণ।

ব্যাপার কি? কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য যাঁরা ওখানে রয়েছেন সবাই হতবাক হয়ে গেছেন! এদিক ওদিক তাকিয়ে সকলে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা।

কাঠুরে গাছে উঠে কাঠ কাটছে। ওখান থেকে খুব দূর নয়—কাছেই। হতবাক হয়ে সকলে লক্ষ্য করল বৃক্ষে কুঠারাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরে উঠছেন। কোন কৃত্রিমতা নেই, এ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। আশ্চর্য![১]

কেশবচন্দ্র যেমন অবাক হয়েছেন তেমনই অন্তর তাঁর অনির্বচনীয় আনন্দে শিহরিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণের জননী কেমন তিনি যেন তার আভাস পাচ্ছেন। এই কি বিশ্বের অণুপরমাণুর সঙ্গে আপন সত্ত্বাকে মিশিয়ে দেওয়া? আত্মপ্রেমের মুক্তাঙ্গণে বিশ্বপ্রেমের আলো? জগৎ-জননীকে জগতের রূপ-রস -গন্ধ-শব্দ স্পর্শের মধ্যে অনুভব করা? বিশ্বৎ-বিধাত্রীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া?

কেশব নিবাতনিষ্কম্প রামকৃষ্ণের দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে অবাক হয়ে এই সব কথা ভাবলেন।

ঈশ্বরের প্রতি ওঁর কি গভীর অনির্বচনীয় ভালবাসা। বৃক্ষে আঘাত লাগছে, যেন বিশ্বজননীর অঙ্গে আঘাত লাগছে। অদ্ভুত প্রেমবোধ! এর ব্যাখ্যা বুঝি হয় না, এ যে কেবল উপলব্ধির বস্তু! কেশব ভাবছেন ঈশ্বরের অবয়বে, অর্থাৎ সমগ্র জগতের মধ্যে যেন রামকৃষ্ণ জড়িয়ে আছেন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর ভাবতরঙ্গে তাঁর হৃদয় বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তিনি আজ স্পষ্ট চিনতে পারলেন রামকৃষ্ণকে।

---

১ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২৫২—২৫৫

## ৬

রামকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দির দেখতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন কেশবচন্দ্র। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসবের পরই তিনি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন।

—"আমাদের সমাজে আপনাকে যেতে হবে। আমরা আপনার মুখে ঈশ্বর কথা শুনব।"

—"তা তুমি বলছ আর আমি যাব না? নিশ্চয়ই যাব।"

কেশবের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেন রামকৃষ্ণ। তবু যাই যাই করে দেরি হয়ে গেল।

অবশেষে একদিন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলুটোলার ব্রাহ্মমন্দির দেখতে এলেন। ব্রাহ্মসমাজে ইতিপূর্বে তিনি দু'একবার এসেছেন। ব্রাহ্মমন্দির দর্শন করবেন এই প্রথমবার।

বেশ একটু আগেই এসেছেন তাঁরা। মন্দিরের বহির্দ্বার খোলার সময় এখনও হয়নি—ফটক বন্ধ আছে। ভক্তজন এখনও কেউ আসেনি। তাঁদের দেখে দরোয়ান ফটক খুলে দিল। নীরব শান্ত কোলাহলহীন ব্রাহ্মমন্দিরে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন।

মন্দিরের চারিদিক প্রফুল্ল নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ গভীরে মগ্ন। ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি ঘটল। হৃদয় তাঁকে আলতোভাবে ধরে থাকলেন।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে কেশবচন্দ্র ও আরও অনেকে এসে গেছেন। সকলে ব্যস্ততার সঙ্গে রামকৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সমাধিস্থ অবস্থাতেই তাঁকে ধীরে ধীরে মন্দির বেদীতে বসান হ'ল। ওঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতির্ময়। সকলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙ্গে। কিছুক্ষণ পর তিনি চোখ মেলে চাইলেন। হাসিমুখে কেশবকে দেখলেন। কেশবও চেয়ে আছেন ওঁর দিকে দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য নিয়ে।

রামকৃষ্ণ কেশবকে বললেন, "এ স্থান বড় পবিত্র। মন্দিরে প্রবেশ করেই তা বুঝতে পারলুম। এখানেও মা বিরাজিতা। মনে হ'ল এই গাম্ভীর্যপূর্ণ পবিত্র স্থানে বসে কত লোকে পরমব্রহ্মের ধ্যান করে, তাঁকে ডাকে। তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। প্রাণটা কেমন ক'রে উঠল।"—

এই কথাতেই তিনি সেখানকার ব্রাহ্মভক্তদের অন্তর জয় করে নিলেন। রামকৃষ্ণের ভেদাভেদ নেই, তিনি সত্যপরায়ণ এ তাঁরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলেন। ব্রাহ্মধর্মও যে সত্য ধর্ম তা তিনি যেমন বোঝালেন তেমনই বুঝিয়ে দিলেন যে ঈশ্বরের কাছে জাতের পার্থক্য বা ধর্মমার্গের পার্থক্য বলে কিছু নেই। ঈশ্বরভক্তের জাত এক। এ মন্দিরে মার সাকার মূর্তি নেই তাতে কি—নিরাকারই যে তাঁর আর এক রূপ।

কিছু পরে রামকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্রের গৃহে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মভক্তরা। সেখানে বৈঠকখানা ঘরে বসে হাসি মুখে তিনি বললেন,—

"কেশব! তোমাদের ওখানে আমার মাকেই আরেক রূপে দেখলুম। তোমরা যে

এই ধ্যান কর এটি খুব ভাল, তবে সাকারবাদীদের ভক্তিভাব নিলে আরও ভাল হবে।"[১]

"তোমাদের প্রার্থনাও বেশ চমৎকার। শুনতে ভাল লাগে। ভাব এসে যায়। কিন্তু তোমরা অত ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা বল কেন? জগতের সবকিছুই তো তাঁর ঐশ্বর্য। এত বর্ণনার কি দরকার। ঐশ্বর্যের এত কথা বললে মনে কামনা আসে।"—তারপর একটু থেমে বললেন, "সবই সত্য। সাকারও সত্য, নিরাকারও সত্য। দুইই একের বিভিন্ন রূপ, লীলাময়ী মায়ের লীলা।"

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, "সাকার মানো আর নিরাকারই মানো শুদ্ধা ভক্তি না হ'লে কিছুই হবে না জেনো। সত্যপরায়ণতা, প্রেম ও বৈরাগ্য—সাধনমার্গে এই তিন না হ'লে অন্তঃদৃষ্টি তো খুলবে না। ধারণা না হ'লে সাকার নিরাকার সব মিথ্যে। আবার অধিকার ভেদে ধারণা হয়। সম্যক ধারণায় সব একাকার।''

গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে সকলে রামকৃষ্ণ-কথা শুনলেন। কিছু সময় পর তিনি হেসে হেসে আবার বললেন, "আমি তোমাদের বললুম, তোমরা যেমন হোক বুঝে নিও।"

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কথাগুলি শুনছেন, তাঁর নয়ন দুটি নিমীলিত। দুই করতল অঞ্জলিবদ্ধ। সত্যপরায়ণতা, প্রেম ও বৈরাগ্য এগুলি না হলে ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া যায় না এ তাঁরই মনের কথা যে! রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী তাঁর উপলব্ধির কথাই বলছে।—

—"ঈশ্বর বলিলেন, আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছাপূর্বক পোষণ করে তাহারা বিশ্বাসী-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত নহে।

সত্যের নিয়ম—জিহ্বা দ্বারা সত্যকথন সর্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা সুমিষ্ট, ব্যবহার মঙ্গল-কর, সহবাসে নিশ্চিন্ত আনন্দ, শত্রু জানিলেও ভালবাসা, অপ্রেম পাইলেও প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ—অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না, ধনস্পর্শ যতদূর সম্ভব পরিহার, সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, দারিদ্র্য মধ্যে প্রফুল্ল থাকা, অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান, দেবদত্ত ধনমানে ভোগবিবর্জিত কৃতজ্ঞতা, সম্পদে বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানগণকে চিনিয়া লইবে।"[২]

রামকৃষ্ণের আশ্বাসভরা মুখের পানে চেয়ে সত্য, প্রেম ও বৈরাগ্যের কথাই ভাবছেন কেশবচন্দ্র। তাঁর মনোমুকুরে দেশের অগণিত নরনারীর মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। এরা সবাই ত ঈশ্বরের সন্তান। তাঁর হৃদয় প্রবল ভাবাবেগে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। তিনি পরমেশ্বরের কাছে নীরবে প্রার্থনা জানালেন;—

"হে দীনবন্ধু! করুণা সাগর! সকল দুঃখ-দুর্দশা ভুলে আমরা যেন আনন্দে থাকি এই করুণা কর। প্রভু, আমাদের সত্য জ্ঞান, সত্য-চেতনা ও শক্তি দাও। দুর্বল

---

১ আচার্য কেশবচন্দ্র (মধ্য বিবরণ)—গৌরগোবিন্দ রায়।

২ তপোবনে ঈশ্বরের নামে বিধি ঘোষণা ১৭. ৩. ১৮৭৫। —কেশবচন্দ্র সেন

অসহায় মানুষের প্রাণে আলোক বর্তিকা জ্বলে উঠুক"—কেশব মনে মনে ঈশ্বর-চরণে এই প্রার্থনা করছেন, তাঁর কোন হুঁশ নেই, রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেলেন। মধুর কণ্ঠে রামকৃষ্ণ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "কই গো, কেশব ! তোমরা ব্রহ্মনাম কর। গান গাও ; শুনি।"

"তার চেয়ে আমাদের গান শোনান আপনি। আপনার কণ্ঠ বড় মধুর, বড় মর্মস্পর্শী।"—

কেশবের কথায় রামকৃষ্ণ বললেন, "গান হ'ল অন্তরের বস্তু, প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। তা এস, আমরা সবাই মিলে গান গাই, তাঁর নামকীর্তন করি।"—

গানের কথা উঠ্‌তেই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল তাঁর তানপুরায় তার বাঁধতে শুরু করেছিলেন। খোল করতাল বেজে উঠল। ত্রৈলোক্য প্রথমে গান ধরলেন,—

"ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী
দীনবন্ধু, পতিত-পাবন।
কাঙ্গাল পানে, প্রেম-নয়নে, চাও হে একবার
এক বিন্দু ভক্তি সুধা, করহে বিতরণ।"—

গানে সবাই গলা মেলালেন। মিলিত কণ্ঠের সংগীত-সুর ধ্বনি সমস্ত গৃহে গমগম করে বাজতে লাগল। গান গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন, কেশবও তাই। উভয়ে ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দে গানের তালে তালে নৃত্য করতে লাগলেন—

"ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী
দীনবন্ধু, পতিত পাবন।"—

গান ভুলে সবাই অবাক-চোখে চেয়ে রইল দুই প্রেমিক পুরুষের দিকে। এ মিলন-দৃশ্য যাঁরা দেখছেন তাঁরা কত না ভাগ্যবান !

কিছু সময় পর গান থেমে গেল—সকলের মুখে তৃপ্তির আনন্দ খেলছে। এরপর কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রামকৃষ্ণের আহার্যের ব্যবস্থা করা হ'ল। তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন কেশব।

কেশবচন্দ্রের মা সারদাসুন্দরী দেবী ও বাড়ির অন্যান্য পুরমহিলারা রামকৃষ্ণকে প্রণাম জানালেন। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ ওঁদের প্রতি-প্রণাম করলেন। স্ত্রীজাতি ভবতারিণীর অংশ, সেই জ্ঞানে তিনি প্রণাম জানান।

"আজ আমাদের মহাভাগ্য"—সারদাসুন্দরী অস্ফুটে কথা কটি বললেন।

—"সেকি, আমি তৃণের তৃণ ! মহাভাগ্য তো আমারই মা।"—তারপর আরও একটু হেসে রামকৃষ্ণ বললেন, "মা, তুমি সাক্ষাৎ দেবী। তা না হ'লে তোমার অমন ছেলে !" —বলা বাহুল্য কেশবচন্দ্রকে উল্লেখ করে কথাটি বলা।

নীরবে কথাগুলি শুনলেন সারদাসুন্দরী। আসন পেতে আহার্য সামগ্রী সাজিয়ে বললেন "বাবা, একটু কিছু মুখে দিন।" হাতে তাঁর একটি সুদৃশ্য হাতপাখা।

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে আসনে বসিয়ে দিলেন ও সযত্নে হাত মুখ ধুইয়ে গামোছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন।

মিষ্ট ও ফল পরিবেশন করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ তার সামান্য কিছু মুখে দিলেন। তিনি খাচ্ছেন আর শিশুর মত হাসছেন।

তাঁর আহার সমাপ্ত হ'লে কেশবচন্দ্র আবার তাঁর হাত মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিলেন ও তাঁকে ধীরে ধীরে আসন থেকে তুলে ধরলেন।

সারদাসুন্দরী রামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে বললেন,—"বাবা, আবার পায়ের ধুলো দেবেন।"

—"মা যদি টানে তবে আসব।"—হাসতে হাসতে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন।

আরও কিছু সময় কেশবচন্দ্রের বাড়িতে কাটিয়ে তিনি হৃদয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর রওনা হলেন। যাবার সময় কেশবকে বললেন, "ওখানে যেতে দেরি করনা কেশব। আমি পথ চেয়ে থাকব।" কেশবচন্দ্র হাসিমুখে ওঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন।

## ৭

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে মর্মাহত কেশবচন্দ্র সরে এসে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গড়লেন।[১] ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সত্যোপলব্ধিকে রূপায়িত করার জন্য অন্তরের তাগিদ তো ছিলই, তাছাড়া তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সুনীতির বিবাহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ঘরে বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। কেশবচন্দ্রের শিরে মিথ্যা অপবাদ, অসম্মান ও কুৎসা বর্ষিত হ'ল। ব্যথিত অন্তরে তিনি প্রিয়জন অনেকেরই কাছ থেকে দূরে চলে এলেন। তবে জীবনের উদ্দেশ্য ভুললেন না, চলার পথে থেমেও পড়লেন না। সবই ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জেনে নবোৎসাহে কর্মসাগরে ঝাঁপ দিলেন। চিরকাল তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ প্রাণে অনুভব করে চলেছেন, আজও চলবেন। রামকৃষ্ণের এই কথাগুলি মনে পড়ল কেশবের।

"লোক না পোক। লোকের কথা ধরতে নেই। ওরা মানুষকে হয়ত এইমাত্র ওঠাল আবার পরক্ষণেই নামাল। লোকের কথা তাই ধরতে নেই।"—

সত্যিই লোকে কত কি বলতে পারে। মুখের কোনও ট্যাক্স নেই—তাই লোকের কথা ধরতে নেই। নিজের আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। কেশব রামকৃষ্ণের কথাগুলি যত ভাবেন ততই তাঁর ইচ্ছা হয় একবার ছুটে চলে যান দক্ষিণেশ্বর —সেখানে শান্তির স্নিগ্ধ কোলে চঞ্চল মনটা হয়তো শান্ত হবে। আপনাকে ঈশ্বর চরণে আরও গভীরভাবে নিবেদন করলেন তিনি।

কেশবচন্দ্র ধর্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবকে সার্থক করতে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। রামকৃষ্ণ একবার তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি লোক বুঝে দলে নাও।" আজ খুব ভাল-ভাবেই তিনি কথাটির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। ভুল বোঝাবুঝি, মিথ্যা দোষারোপ, কলহ প্রভৃতির মধ্যে কেশব থাকতে পারলেন না। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদ ত্যাগ করলেন। অথচ কুচবিহার মহারাজের সঙ্গে কন্যার বিবাহ ব্যাপারে তাঁর কিই বা দোষ ছিল! তিনি নিজে এই বিবাহের জন্য কিছুমাত্র উদ্যোগী হন নি। বিধাতার ইচ্ছাতেই যেন এই বিবাহ ঘটে গেল।

---

১ অন্যান্য কারণগুলি ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভক্তদের মধ্যে দলগত সংহতির অভাব ও দলভুক্ত লোকেদের অহংবোধ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণার হীনতা। কেশবচন্দ্রের সমাজের প্রায় সকলেই তথাকথিত "সংসারী" ছিলেন। তাঁদের নিষ্ঠার অভাব ছিল। চরিত্রে তত ত্যাগবল ছিল না। বহু শিক্ষিত ব্রাহ্ম যথার্থই ন্যায়পরায়ণ, মার্জিত, কুসংস্কার মুক্ত হলেও ছিলেন প্রচণ্ড রকমের যুক্তিবাদী। তাঁদের অনেকেরই জীবনের অনুশীলনের ক্ষেত্রে মনে হয় যুক্তি ও বুদ্ধির প্রভাব বেশি ছিল। তার ফলে জন্ম নিয়েছিল অহংবোধ এবং তার থেকে শ্রেষ্ঠতাবোধ। এ থেকে মানুষের 'নিজে অভ্রান্ত' এই বোধ জন্মায়।

কুচবিহারের বড় রাজকুমারের যখন ষোলবছর বয়স তখন তাঁর তত্ত্বধায়ক ইংরাজ গবর্নমেণ্ট তাঁর বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। অবশ্য রাজমাতার ইচ্ছার জন্যই ব্রিটিশ সরকারের এই তৎপরতা। বড় রাজকুমার বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ড যাবেন তাই যাত্রার পূর্বে তাঁর বিবাহ হওয়া দরকার—রাজমাতার এই মনের অভিলাষ ছিল।

গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট যাদব চক্রবর্তী রাজঘটক হিসাবে অনেক খোঁজখবর করলেন ও কলকাতায় এসে এখানে ওখানে ভাল বংশের মেয়ে দেখলেন। কোন মেয়েই তাঁর পছন্দ হ'ল না। অবশেষে একটি বিদুষী ও সর্বগুণসম্পন্না কন্যার খোঁজ মিলল। কন্যারত্নটি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা আত্মজা সুনীতি।

যাদব চক্রবর্তী ও অন্যান্য কুচবিহার রাজপ্রতিনিধিরা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের অভিলাষ শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। রাজি হলেন না, তাঁদের জানালেন—"না, এ সম্ভব হয় না। আমি সামান্য মানুষ, আমার মেয়েও সামান্যা। আমি ও কুচবিহার মহারাজা পৃথক ধর্মাবলম্বী। আমি বহুবিবাহ বিরোধী; রাজারা বহু বিবাহ করেন। আমি ওখানে কন্যার বিবাহ দিতে পারি না। পরন্তু আমার কন্যার বয়স এখন চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয় নি, ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মে চৌদ্দ বছরের কমে বালিকার বিবাহ হয় না।"

তবু রাজপ্রতিনিধিরা কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যাকে দেখাতে। তাঁরা কন্যা দেখে বুঝলেন যে কন্যা বিদুষী, দেখতেও সুশ্রী—রাণী হওয়ার উপযুক্ত।

রাজপ্রতিনিধিরা ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কিছুদিন পর কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার ডেলটন সাহেব এলেন ও পুনরায় কেশবচন্দ্রের কাছে ঐ প্রস্তাব রাখলেন। তিনি জানালেন যে গবর্ণমেণ্ট ও কুচবিহারের মহারাণীমাতার ইচ্ছা যে কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গেই কুমারের বিবাহ হোক। তাঁদের আবেদন যে রাজকুমারও একেশ্বর বিশ্বাসী ও বহুবিবাহ বিরোধী। বিবাহের আচার পদ্ধতিও পৌত্তলিকা বর্জিত হবে, তবে পৌত্তলিকতা দোষশূন্য রাজপরিবারের কিছু আচার বিচার সংযুক্ত থাকবে। বাগদান, আশীর্বাদ ইত্যাদি হ'লে বড় রাজকুমার ইংলণ্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গমন করবেন এবং ফিরে আসতে আসতেই তাঁর আঠারো বছর পূর্ণ হয়ে যাবে এবং কন্যাও অনেক আগেই চোদ্দ বছরে পদার্পণ করবে তখন আনুষ্ঠানিক বিবাহ হবে।

বারবার অনিরুদ্ধ হয়ে কেশবচন্দ্র এই বিবাহের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছারই ইঙ্গিত পেলেন। তাঁর ধর্মমতেরও হানি হচ্ছে না মনে করে অবশেষে মতদান করলেন। কিন্তু জানা গেল মহারাণী মাতা বিবাহ না দিয়ে রাজকুরারকে ইংলণ্ড পাঠাতে রাজি নন। কেশবচন্দ্রকে সেকথা জানিয়ে অনুরোধ করা হ'ল। তিনি বললেন, "না তা কোন মতেই সম্ভব নয়। পাত্রের বয়স এখনও আঠারো হয়নি এবং আমার কন্যাও অনুত্তীর্ণা চৌদ্দ। ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মমত এ বিবাহ হতে পারে না।" তখন কুচবিহার রাজার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হ'ল যে এখন এই পরিস্থিতিতে বিবাহ-অনুষ্ঠান না হয় নাই হ'ল ; বাগদান, আশীর্বাদ ও সম্প্রদান এগুলি হয়ে যাক এবং কন্যা ও পাত্র উভয়ে পৃথক পৃথক ভবনে থাকবেন। তারপর বড় রাজকুমার ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলে

বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং উভয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করবেন। বারংবার পাত্রপক্ষের অনুরোধ এবং এ ব্যাপারে ঈশ্বরের শুভ ইঙ্গিত রয়েছে মনে করে কেশব রাজি হলেন। বোধ হয় এটাই তাঁকে অন্যান্য ব্রাহ্মর কাছে অপরাধী করে তোলে।

ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতায় ব্রাহ্মমতেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এইরূপ স্থির হয়। বিবাহ কুচবিহারে হবে এবং কন্যাপক্ষের খরচও রাজবাড়ি বহন করবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিবাহকার্যের প্রধান পুরোহিত হিসাবে মনোনীত হন। তিনি এবং কুচবিহার রাজের সভাপণ্ডিত উভয়ে মিলে পৌত্তলিকতা বর্জিত বিবাহ পদ্ধতির খসরা তৈরী করলেন। সে সময় ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি বলে সঠিক কিছু লিখিত আকারে ছিল না। বলাবাহুল্য ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি থেকেই সংকলিত কেবল যেখানে যেখানে পৌত্তলিকতার আভাস আছে সেগুলি বাদ।

তবু সম্পূর্ণ ব্রাহ্মমতে বিবাহ পর্ব সমাধা করতে পারা যায়নি। প্রথমদিকে রাজি হলেও বিবাহ কালে কুচবিহার রাজবাড়ি মারপ্যাঁচ কসতে থাকে। তাঁদের ইচ্ছা ছিল হিন্দুমতেই শুভকার্য সম্পন্ন করার। কুচবিহারে কেশব রাজবাড়ির আচরণে নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করলেন—কিন্তু কি করবেন ঈশ্বর সাক্ষী রেখে কন্যার বিবাহে মতদান করেছেন তিনি।

অবশেষে বিস্তর হাঙ্গামার পর ডেপুটি কমিশানার ডেলটন সাহেবের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে কেশব তাঁর কন্যা সুনীতির বিবাহ ব্রাহ্মমতেই দেবেন কিন্তু তারপর তিনি কন্যা নিয়ে উঠে গেলে রাজকুমারের সম্মুখে হোম যাগ ও কিছু হিন্দু আচার অনুষ্ঠিত হবে। এইভাবে বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

ভিতরের মূল ঘটনার বিষয় কিছুমাত্র জানতে চেষ্টা না করে অনেকেই ব্রহ্মানন্দ কেশবের বিচার করতে এগিয়ে এলেন। কঠোর সমালোচনা করে তাঁকে সমাজচ্যুত করে ও চরিত্রে কালিমা লেপনে তৎপর হলেন।[১]

যা হোক এই ঝড়ঝাপটাকে কেশবচন্দ্র ঈশ্বর প্রেরিত বলে গ্রহণ করলেন এবং ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে "নববিধান" ব্রাহ্মসমাজ গঠন করলেন। মনে হয় তিনি শুধুমাত্র কন্যার বিবাহ দেবার জন্যই এই বিবাহে রাজি হন নি। এর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অনুভব করেন এবং ভাবেন যে কুচবিহার রাজা যদি ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হ'ন তাহলে হয়ত ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের আরও সুবিধা হবে।

দক্ষিণেশ্বরে বসে রামকৃষ্ণ কুচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত শুনলেন। কন্যার বিবাহ ব্যাপারে তিনি কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করলেন।[২] তবে পাত্রীর বিবাহের বয়স সম্বন্ধে

১ (ক) কেশবচরিত—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।
(খ) আচার্য্য কেশবচন্দ্র ( মধ্য বিবরণ )—গৌরগোবিন্দ রায়।

২ পরবর্তী কালেও যদি কেউ কুচবিহারের বিবাহের কথা তুলে রামকৃষ্ণের কাছে কেশবচন্দ্রের নিন্দা করত তখুনি তিনি বলতেন, "কেশব নিন্দার তো কিছু করেনি বাপু। ঠিকই করেছে। সে সংসারী, নিজের ছেলেমেয়ের যাতে কল্যাণ হয় তা করবে না? ধর্মপথে থেকে সে এই কাজ করেছে, এতে নিন্দে কেন বাপু। সে ধর্মহানিকর কিছুই করেনি পরন্তু পিতার কর্ত্তব্য করেছে।"

ব্রাহ্মধর্মের নিয়ম শুনে বললেন, "জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে বিধাতার ইচ্ছায় হয়। এগুলোকে কঠিন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা চলে না। কেশব কেন এমন করতে গেল।"—

কেন কেশবচন্দ্র নিয়ম বাঁধলেন ?

"ঈশ্বরের বিধিতে বন্ধন চলে না। কিন্তু মানুষ তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধি নিয়ে শুভকে খু'জে পেতে প্রয়াসী হয়।"

এ সময় হিন্দুধর্ম আবিলতায় মলিন—দেশে ধর্মীয় স্থিতি নেই। সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। একদিকে কদর্য কুসংস্কার ও হীনতা সমাজের প্রগতিকে রুদ্ধ করছে, অন্য দিকে খ্রীষ্টধর্মের আঁচ এসে লাগছে। ধর্মের নামে কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমাজের উচ্চস্তরের এক শ্রেণী কি অকাজ-কুকাজই না করছে, অসহায় মানুষদের উপর অত্যাচার ও নারী নির্যাতনে বলবান ও ধনবান সম্প্রদায়ের অনেকেই তৎপর। অসহায়া নারী পুরুষের হাতের ক্রীড়নক, তাদের সম্ভোগের বস্তু ও সংসারের সুবিধার যন্ত্র।

কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে ধর্মীয় জীবন ও সমাজ জীবন আচ্ছন্ন। সতীদাহের মত কু-প্রথা বিভীষিকার রাজত্ব করছে। অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদান, কুলীনের বহু-বিবাহ, ছু'ৎমার্গ, স্বার্থ ও দলাদলিতে সমাজ পঙ্গু। আবার অন্য দিকে ব্রিটিশ আধিপত্যে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তারে অনেকের মনে জেগে উঠেছে ধর্ম অবিশ্বাস।

এই কু-ভাবের গতিকে রুদ্ধ করতে ও সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করতে মহানায়ক রামমোহন বিদ্রোহী হলেন। হিন্দুসভ্যতার অতীতকালের স্বর্ণযুগে তাকিয়ে বৈদিক ধর্মের আলোচনায় আপনাকে প্রভাবিত করলেন। অনৈতিকতার আবিলতাকে মুছে দিতে এবং জাতিকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি হ'ল।

অব্যবহিত পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার চমকে দেশের তরুণদের চোখ ঝলসে গেল। হিন্দুধর্মে আবিলতা ও কুসংস্কার থাকার জন্য ধর্মের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ রইল না। তারা অনেকটা বেপরোয়া হয়ে উঠল। মদের স্রোত দেশে বয়ে যেতে লাগল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্তুতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার প্রবল ঝোঁক এল যুব সমাজে। খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হবার ইচ্ছা জাগল অনেকের মনে।

এই বিকৃত চেতনাকে বাধা দিতে এগিয়ে এলেন যুগপুরুষ কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্ম-ধর্মের ধ্বজা তিনি নানাদিকে উড়িয়ে দিলেন। বৈদিক ধর্মের গুণগুলি নিয়ে ব্রাহ্মধর্ম সৃষ্ট হয়েছিল—কেশব তারও সংস্কার করলেন। খ্রীষ্টধর্মের ভাবও কিছু গৃহীত হ'ল, হিন্দুধর্মের ভাবগুলি অনেক আগেই নেওয়া হয়েছে। সমাজ সংস্কার করা হ'তে লাগল নানা পথে নানা ভাবে। জাতিভেদ তুলে দেওয়া হ'ল, মদ্যপান নিবারণ করার প্রয়াস চলল, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের দ্বারা মনুষ্যোপযোগী চরিত্র গঠনের চেষ্টা হ'ল ; নারী-জাগরণের চেষ্টা চলল, বহু-বিবাহ বন্ধের উদ্যোগ হ'ল, বিধবা-বিবাহের প্রচলন আরও জোরদার করা হ'ল, অসবর্ণ-বিবাহও চালু হ'ল, বাল্য-বিবাহ বন্ধ করার জন্য পুত্র-কন্যার বয়ঃ সীমা বাঁধা হ'ল। কেশবচন্দ্রের কি বিরাট কর্মপ্রবাহ !

আরও এক পূর্ববর্তী যুগে হিন্দু সমাজ জীবনে এরূপ আবিলতা এসেছিল। সেদিনও বিদ্রোহী হয়েছিলেন ভারতীয় আর এক মহানায়ক। হিন্দুধর্ম হ'তে সংস্কৃত

হয়ে নতুন পথে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের।[১] আজ রাজা রামমোহনের সংস্কার-চিন্তার পথ ধরে, ব্রহ্মানন্দ কেশব বাংলা তথা ভারতবর্ষকে নবরূপে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন। সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং স্খলন প্রতিরোধ করতে তাই কেশবকে নানা নিয়মের নিগড় বাঁধতে হ'ল।[২]

সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব নিয়ে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজ গড়লেন।[৩] মানুষ একই পরিবারভুক্ত একই সমাজের অন্তর্গত ও একই ঈশ্বরের সন্তান তাঁর কৃপাপাত্র। নববিধানের এই মূল সূত্র। এ সময়ে তিনি নিজে হিন্দুশাস্ত্রের ও খ্রীষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতের সামঞ্জস্য স্থাপনের পথ দেখান। রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঈশ্বর আলোচনায় অনেক দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। বিশেষভাবে রামকৃষ্ণের প্রেমের ধর্ম তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে। নববিধান সমাজের প্রচারকদের সঙ্গে পুর্ণোদ্যমে প্রচারকার্য চালাবার জন্য তিনি কর্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। প্রেরিতদলের প্রতি সেবকের নিবেদন ঘোষিত হ'ল :—

"......পৃথিবীর সুখ-সম্পদ কামনা করিবে না। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পর সুখে সুখী হইবে, পর দুঃখে দুঃখী হইবে। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। ভিন্ন জাতি কিম্বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন

১ কিন্তু আশ্চর্য ইতিহাসের সাক্ষ্য। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের চিরন্তন প্রবাহ সবকিছুকে ছাপিয়ে বহমান। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মৃত্তিকা দিয়েই রূপায়িত একথা বলা যায়। হিন্দুধর্ম হতে উদ্ভূত হয়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের মধ্যেই মিশে গেছে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মও তদ্রূপ পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্মকে এই দুই ধর্মমার্গ নবীন বলে বলশালী করেছে এখানেই এদের সার্থকতা।

২ একটা কথা অনুভব করা দরকার যে ধর্ম ও সমাজ দুটি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হলেও ভারতবর্ষে বহুযুগ আগে থেকেই এরা এক হয়ে জড়িয়ে আছে।

৩ রামকৃষ্ণের ভক্ত অনেকেই কেশবচন্দ্রের 'নববিধানে'র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ ইঙ্গিতও করেছেন যে নববিধানের মন্ত্র কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন অথচ ঠিকমত রূপদান করতে পারেন নি।

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ( ৫ম ) পৃঃ ৭৬ ]

এ মতবাদ ঠিক নয়। নববিধানের যা মূলসুর সেটি জগতের সকল মহামানবদের অন্তরে আবাহমান কাল হতেই কিছু না কিছু ধ্বনিত হতে দেখা যায়। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' কিছু নতুন বিধান না হলেও গঠনে তার যথেষ্ট নতুনত্ব ছিল। কেশবচন্দ্রের মনে নববিধানের ভাব ও চিন্তাধারা রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, সেটি হয়তো তেমন বাস্তবমুখী ছিল না, নয় তার আদর্শ গ্রহণ করার মত যুগ হয়তো এখনও তৈরী হয় নি—তাই নববিধান স্থায়িত্ব লাভ করে নি।

নববিধান প্রসঙ্গে আলোচনা কালে পরবর্তী কালে রামদত্তকে রামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন, "ওতে সার আছে বৈকি। তা না হলে লোকে কেশবকে মানে কেন?..... ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এরকম একটা হয় না।" [ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য় ভাগ) ]

প্রেরিতের দল পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত বিবেকী, বৈরাগী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমাদিগের কু-কামনা, আসক্তি, মায়া, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা রহিয়াছে। নববিধানের অস্ত্রধারণ করিয়া এই সমুদয় শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর।"—

রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ ও কেশবচন্দ্রের সর্বধর্ম সমন্বয়বাদের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমন আছে মিল। রামকৃষ্ণের ভাবনা—"যত মত, তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক।" আর কেশবচন্দ্রের উপলব্ধি হল, "অনেক মত কিন্তু পথ এক, লক্ষ্য এক।"[১]

১ কেশবচন্দ্রের মনে নববিধানের ভাব বহু পূর্ব হ'তেই অঙ্কুরিত ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রেমের ধর্ম (Religion of Love) নামক প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলকে এক সার্বভৌমিক ধর্মে এক হতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন :—

"O my friend be not a sectarian. Sectarianism is opposed to the very vital principal of religion, to wit, love. Sacrifice all that is exclusive, narrow and antagonistic.

Sacrifice all that soweth discord and unbrotherly feelings between man and man, if you seek true religon, for true religion is universal together—not to separate, to consolidate the whole man of man-kind—not to divide it into countless sections, to annihilate, not to raise partitions, to attract, not to repel ; to make a brother, not an enemy. This is the very object of Brahmoism......Love, Union, and Peace are her watch words.

A Brahmo sees, all in relation to god. The world is home, human race his family. Come all ye religion sects, let us all fling away sectarian bigotry, and meet together on the common ground of universal religion."

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে নিজ উপলব্ধিকে সুন্দরতম করে যে ভাবে ভাঙ্গাগড়ায় কেশব নিজেকে তৈরী করেছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে অনেক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে সে সম্ভাবনায় পড়েছিল ছেদ, না হ'লে হয়ত ইতিহাস অন্য রূপ লেখা হ'ত।

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের বন্ধুত্ব ভাব, ভালবাসা এক অপূর্ব বস্তু। রামকৃষ্ণের মধুর আকর্ষণে কেশবচন্দ্র তাঁর শতকাজ ফেলে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসেন আবার অন্যদিকে মনের মানুষের জন্য মন কেমন করলেই রামকৃষ্ণ কলকাতায় কেশবের বাড়ি যাবার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েন।

এখন শরৎকাল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রোৎসবের আগে কেশব একদিন রামকৃষ্ণকে দেখতে দক্ষিণেশ্বর এলেন। সদা হাস্যময় রামকৃষ্ণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, "আরে এস, এস। আমি যে তোমার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। ওগো তুমি শ্যাম, আমি রাধা—তুমি শ্যাম, আমি রাধা।"

রামকৃষ্ণের কথা শুনে কেশব আনন্দের হাসি হাসতে লাগলেন। প্রণাম জানালেন তাঁকে। রামকৃষ্ণও সকলকে প্রতি প্রণাম জানালেন। আনন্দে উদ্বেলিত তাঁর অন্তর। দু'জনে হাত ধরলেন দু'জনার; বসলেন মুখোমুখি।

"কেমন আছেন?"—

কেশব সঙ্গে করে মিষ্টি ও ফল এনেছেন, রামকৃষ্ণকে তারই একটু খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞাসা করলেন।

বালক স্বভাব রামকৃষ্ণ খেতে খেতে হেসে বললেন, "মা যেমন রেখেছে তেমন আছি গো। মার নামে মজে আছি।"

কেশবচন্দ্র অল্পক্ষণের জন্য এসেছেন, তবু নানা কথা হ'ল—ঈশ্বরীয় ভাবের কথা। আত্মা সর্বমুক্ত স্বাধীন এ সম্বন্ধে কথা বললেন রামকৃষ্ণ। সোঽহং ভাব। অহং ত্যাগ করার কথা বললেন।

"আমি ত্যাগ না করলে হবে না।"

কেশবচন্দ্র উত্তরে হেসে বললেন, "তা হ'লে মহাশয় দলটল থাকে না।"[১]

রামকৃষ্ণ মাথা নেড়ে বিমল হাস্যে বললেন, "আমি 'কাঁচা আমি', 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ করতে বলছি। কিন্তু 'পাকা আমি', 'ভক্তের আমি', 'বালকের আমি', 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বিদ্যার আমি' ত্যাগ করতে বলছি না। এতে দোষ নেই। আমি ঈশ্বরের দাস; আমি ঈশ্বরের সন্তান এর নাম "পাকা আমি"। এতে দোষ নেই।"[২]

সমবেত সবাই উৎসাহ সহকারে কথা শুনছেন। কেশবচন্দ্রের মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব সৌন্দর্য খেলা করছে। তাঁর উজ্জল চোখ দুটি মাঝে মাঝে আরও দীপ্ত হয়ে উঠছে।

ক্ষণ বিরতির পর তিনি কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, "সংসারী আমি, অবিদ্যার আমি 'কাঁচা আমি'—একটা মোটা লাঠির মত। সচ্চিদানন্দ সাগরের

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৩য় ভাগ), ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৮৯।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৩য়) ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৮৯।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম) ভাগেও উল্লেখ আছে এ কথার।

*জল ঐ লাঠি দিয়ে যেন দু'ভাগ করছে।* কিন্তু *'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বালকের আমি', 'বিদ্যার আমি' জলের উপর যেন একটা রেখা। জল এক—বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল দেখা যাচ্ছে।"*

তারপর একটু থেমে বললেন, "শঙ্করাচার্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য।"

অহংভাবের কি সহজ সুন্দর ব্যাখ্যা! আনন্দে কেশব রামকৃষ্ণের দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন।

রামকৃষ্ণ খাবার জল চাইলেন। একজন জল এনে দিলে পাত্রটি হাতে নিয়ে কেশবচন্দ্র ওঁকে জলপান করিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন।

"আমিটাতো যাবে না", রামকৃষ্ণ আবার বলছেন; "তাহলে সে দাস ভাবে থাক।" ভক্ত প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন। কখনও বোধ করতেন 'তুমিই আমি, আমিই তুমি'— সোঽহং। আবার যখন অহংবুদ্ধি আসতো তখন দেখতেন আমি দাস, তুমি প্রভু। একবার পাকা সোঽহং হয়ে পরে দাস হয়ে থাকা, যেমন 'আমি দাস'।[১]

"কি সুন্দর কথা!"—স্মিত মুখে কেশব বলেন। স্বাধীনতার মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করে তিনি 'আমি'কে পাকা করেছেন। তাঁর 'পাকা আমি' তাঁরই নিজস্ব ভঙ্গিমায় তৈরী।—

—"আমার ইষ্ট দেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস, কখনও কাহারও অধীন হইও না, এই প্রধান সৎ পরামর্শ। প্রথম অবধি কায়মনোবাক্যে সাধ্যানুসারে এই মন্ত্র পালন করিয়া আসিতেছি। অধীনতা এই পৃথিবীতে বিষ, অধীনতা রাশি রাশি নরক যন্ত্রণার হেতু।

* * * *

স্বাধীনতাই হইল আদি শব্দ। অধীন হইব না, এই সঙ্কল্প ব্যতীত এ ভাব হইতে আর কি ফল ফলিতে পারে? এই স্বাধীনতা হইতেই অনেক গুরুতর কার্য প্রসূত হইয়াছে। অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না, কাহারও পদতলে পড়া হইবে না, গুরুজনদের নিকট আত্মবিক্রয় করা হইবে না, পুস্তক বিশেষেরও কিঙ্কর হইয়া বন্দনা করা হইবে না, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবারাত্রি তাহারই যশ ঘোষণা করা হইবে না। এদিকে যেমন এই সকল প্রতিজ্ঞা অপরদিকে তেমনই;—স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না, অহংকারের অধীন হওয়া হইবে না, ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত লওয়া উচিত তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না।

* * * *

মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীননতা বিক্রয় করিয়া পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চিৎকার করিতেছে। রকম রকম লোক

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৮৯।

রকম রকম লোকের কাছে পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার এত ইচ্ছা! পাঁচ দশ বৎসর দাসত্বই করিতেছে। এক এক বিশেষ বিশেষ নারীর দাসত্ব করাকে কি বলে? দাস দলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে লোভী বলে। এ সমস্তই পাপ, দাস হওয়াই পাপ। আসক্তি সংসারের রাজা হইলে মজিতে হয়। যে গ্রামে যাই, যে বাড়িতে যাই রাগ বলে দেখ আমার কত চাকর। আমি কত বড় রাজাকে পর্যন্ত মারিতেছি। দাসত্ববোধ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দর্পকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইবে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না।

* * * *

অন্যের ভাল কথায় কাজ করিব না। ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহ করিলাম না, ঈশ্বরের কথায় তাহা আগ্রহের সহিত করিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব, ততক্ষণ কাজ আরম্ভ করিব না। এ প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ হইতে পারে কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী আমার ইহাতে বিপদ না হইয়া লাভই হইয়াছে। বন্ধুদিগকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীর অধীন হই নাই। সন্তানদের মায়াতে কি দেশের মায়াতে আবদ্ধ হই নাই, হইব না। কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে জীবিত কি মৃত কোনও লোক আছেন, যাঁহার নিকট আমি অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি অথবা যাঁহার মায়াতে আবদ্ধ আছি। স্বাধীনতাই আমার চিরকালের আদরনীয় কিন্তু ভক্তিবিহীন স্বাধীনতা আদরনীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহংকারমূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই। বড় হইবার জন্য, উচ্চপদ লাভ করিবার জন্যে, স্বাধীনতা কিনি নই। সে প্রকার স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার। আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি না। আমি ভালবাসিলাম কিন্তু মায়াবদ্ধ হইলাম না। ইহাই যথার্থ ভালবাসা। তোমাদের ভালবাসিলাম কিন্তু অধীন হইয়া যদি লোক ডাকিতাম, আজ আমার দলে শত সহস্র লোক থাকিত। মায়ার দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দাস দলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত আমার দল লোকে পূর্ণ হইত। স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এইজন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদিগের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে এই জন্য বলি সত্যের জয়। স্বাধীনতা মানুষকে বল দিতে থাকিবে। ইহাতে লোকে আসে আসুক গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি ঘৃণা করি। * * * * ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্তা বলিয়া জানি।

* * * *

মানুষকে জীবনের আদর্শ কখনও মনে করি নাই, করিবও না। পূর্ণ আদর্শ মানুষ হইতে পারে না। ঈশ্বরের সন্তান সকলকে আমি যেমন ভালবাসি কে এমন ভালবাসিয়া থাকে অথচ আমিই বলি তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ ভাবিয়া পিতার অপমান করিব না। ঈশ্বরের কাছেই আমি থাকিব।"—[ জীবন বেদ—স্বাধীনতা ]

এই চিন্তাধারায় কেশব তাঁর 'আমি'কে পাকা করেছেন।

ভাবনার ছেদ টেনে রামকৃষ্ণকে কেশব বললেন ;

"সমাজের ভাদ্রোৎসব এসে গেল। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। আপনি যাবেন তো ? লোক পাঠাব কিম্বা নিজে আসব নিতে।"

রামকৃষ্ণ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "বেশ তো যাব। তা তুমি বাপু বড় দেরি কর এখানে আসতে।"

ভালবাসার নিবিড়তায় কেশব বিহ্বল হয়ে গেলেন, মৃদু গলায় বললেন, "আসব, সময় পেয়েই আসব।"

এরপর কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনুগতদের সঙ্গে কলকাতা ফিরে গেলেন।

# ৯

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দশম ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[১] বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগান-বাড়ি 'তপোবনে' ব্রাহ্ম সম্মেলন। রামকৃষ্ণ এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। জয়গোপাল সেনের সেই বাগানবাড়ি যেখানে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ।

রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে এসেছেন। কেশব অভ্যর্থনা করলেন। কাপড়ের লাল রংএর দিকে ইঙ্গিত করে হেসে বললেন, "আজ বড় যে রং, লালপাড়ের বাহার দেখছি।"

উত্তরে রামকৃষ্ণও মধুর হেসে বললেন, "কেশবের মন ভোলাতে হবে যে তাই বাহার দিয়ে এসেছি।"

তা তিনি কেশবচন্দ্রের মন ভুলিয়েছেন বৈকি। কেশবচন্দ্র ঘুম ভাঙ্গালেন বাংলার—ইয়ং বেঙ্গলের। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে সমগ্র দেশ। আর কেশবের মন ভোলালেন রামকৃষ্ণ।

হাসি ঠাট্টা, তামাসা ও ভালবাসায় শুধু কি মন ভোলানো ;—সাকার ভাবের রামধনু রংএ কেশবের মনকে রাঙ্গিয়েও দিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর পবিত্র স্বভাব, অপূর্ব ঈশ্বর ভক্তি ও সর্বধর্মে সমদর্শিতার জন্য তিনি ব্রাহ্মদের আপন জন সদৃশ হয়েছেন। তিনি কেশব ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের যেমন ভালবাসেন তেমন সমালোচনাও করেন তাঁদের কোন কোন কাজের। সাধন ও ভজনের কি কি পদ্ধতি নিলে তাঁদের পক্ষে আরও ভাল হয় তারও ইঙ্গিত দেন রামকৃষ্ণ।[২]

কঠোর সমালোচনা করে কেশবচন্দ্রকে অবহিত করতে চেয়েছেন তিনি—"যাকে তাকে দলে নিও না।"

১ দিনটি ছিল সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯।

২ কোন কোন নামী ব্রাহ্মের প্রথাগত ভক্তির দৃশ্য দেখে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "উপাসনা সভায় যখন ওঁরা চোখ মুদে ছিলেন তখন আমি ওদের লক্ষ্য করছিলাম। আমার কি মনে হচ্ছিল জান? মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আমি গাছের তলায় এইভাবে বাঁদরগুলোকে বসে থাকতে দেখেছি। অনড়, অসার, যেন কিছুই জানে না।...কিন্তু তারা তখন একটু বাদে কোন বাগানে কোথায় গিয়ে কি ফল ছিঁড়বে, কি মূল তুলবে, অন্য খাবার জোগাড় করবে তার কথাই ভাবছিল, তার তলে তলে সব মতলব আঁটছিল। তোমার শিষ্যরা আজ যোগসাধন করলেন তা তার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয় না।" [ রামকৃষ্ণের জীবন—রোঁমারোলাঁ ]

ব্রাহ্ম সমাজ ও তার আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন করতে রামকৃষ্ণ এরূপ সমালোচনা করেন নি তা বলাই বাহুল্য। তিনি ভালকরেই জানতেন ব্রাহ্মধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন এদের ত্রুটি মুক্ত করতে। রামকৃষ্ণ রাণী রাসমণিকেও একবার এরূপ মিথ্যা ধ্যান করার জন্য গঞ্জনা দিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ লক্ষ্য করেছেন পৌত্তলিকতার প্রতি কেশবচন্দ্রের নিস্পৃহতা। মনে মনে স্থির করলেন কেশবের ভুল ভাঙ্গাবেন তিনি। একদিন ব্রাহ্মদের উপাসনা শুনলেন, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের অনুপম গুণাবলী বর্ণনা করেছেন ও জীবন পথে জীবন-দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। কেশবের প্রার্থনা রামকৃষ্ণের খুব ভাল লাগল। তিনি তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর ঈষৎ হেসে কৌতুক করে বললেন, "...কিন্তু এত হিসেব দিচ্ছ কেন? ছেলে কি তার বাবাকে বলে, 'ও বাবা তোমার এতগুলো বাড়ি আছে, এতগুলো বাগান আছে, ঘোড়া আছে, এইসব...? যা কিছু আছে বাবা ছেলের হাতে তুলে দেয়। ......আচ্ছা, কেশব! তুমি কি লক্ষ্য করনি যে যখন তুমি উচ্ছ্বাসে ঈশ্বরের গুণ কীর্তন শুরু কর, তখন তুমি পৌত্তলিক হয়ে পড়?" এই কথা বলে রামকৃষ্ণ মধুর হেসে কেশবচন্দ্রকে ঠাট্টা করলেন, "ওগো তুমি নরম রকমের পৌত্তলিকতাবাদী।" কেশব প্রতিবাদ করলেন নম্রভাবে, "না না পৌত্তলিকতাকে ব্রাহ্মরা স্বীকার করে না—আমরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক।"

তখন রামকৃষ্ণ কেশবকে বললেন, "ভগবান সাকার ও নিরাকার দুই-ই। মূর্তি বা অন্যান্য প্রতীকগুলো সমস্তই তোমার গুণাবলীর মতই সত্য। আর ঐ গুণগুলো পৌত্তলিকতা থেকে আলাদা নয়, ওটা কেবল পৌত্তলিকতার নীরস রূপ মাত্র।" ক্ষণ বিরতির পর আবার বললেন, "তুমি গোঁড়া ও পক্ষপাত দুষ্ট হতে চাও? আমি কিন্তু প্রাণপণে চাই ভগবানকে যত রকমে পারি তত রকমে পূজো করতে। অবশ্য, আমার আশা কখনো মেটে নি। আমি ফলমূল দিয়ে পূজো করতে চাই, আমি তাঁর পুণ্য নাম জপ করতে চাই, তাঁর আনন্দে ব্যাকুল হয়ে নৃত্য করতে চাই! * * * যাদের বিশ্বাস ঈশ্বর নিরাকার আর যাদের বিশ্বাস ঈশ্বর সাকার তারা কেউই ভ্রমপূর্ণ নয়—উভয়েই ঈশ্বরকে পায়। দুটি মূল বস্তু হ'ল বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণ।"[১]

রামকৃষ্ণের কথায় কেশব মুগ্ধ হলেন, তাঁর মনের অনেক জিজ্ঞাসার অবসান হ'ল।

সেদিন আরও অনেক কথা বললেন রামকৃষ্ণ। তিনি বললেন জীবনের মূলশক্তি, সৃজনের প্রাণ বীজ ও তার ব্যাপকতার কথা:

"বেঁচে থাক, ভালবাস এবং সৃষ্টি কর। সৃষ্টি করা হ'ল ভগবানের মত হওয়া। যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে তার মূল সত্তায় যখন তুমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন তুমি যা বলবে তাইই সত্যে পরিণত হবে। যখন কোন নিঃস্বার্থ মানুষ আমাদের মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর প্রতিটি কাজ সৎগুণ ও সত্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তিনি অপরের জন্য যা করেন, তাইই অপরের ক্ষুদ্রতম নীচতম স্বপ্নকেও উন্নত করে তোলো। তিনি যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই সত্য এবং শুদ্ধ হয়ে ওঠে, তিনি হ'ন বাস্তবের জন্মদাতা। তাঁর সৃষ্টি কখনও কালের গর্ভে হারিয়ে যায় না...।" তারপর ক্ষণিক থেমে

১ রামকৃষ্ণের জীবন—রোঁমারোল্যা।

বোধ হয় এইরূপ আলাপ-আলোচনার পরই কেশব খুঁজে পেলেন তাঁর উপলব্ধিকে যে পরমব্রহ্মের এক এক বিশেষ গুণই হল এক-এক দেবদেবীর রূপ ও গুণ কল্পনা।

কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে কোমল গলায় রামকৃষ্ণ বললেন, "—তোমার শক্তি আছে, আমি চাই কেশব তুমি তাই করো।"—

কেশবচন্দ্রের ভাবাদর্শ ও রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। তিনি কেশবের মধ্যে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন।

এই ভাবে কেশবচন্দ্রের মন ভোলালেন রামকৃষ্ণ।

আজ ভাদ্রোৎসবের আসরে পরমহংস রামকৃষ্ণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অতিথি। উৎসবে প্রায় ত্রিশ জন ব্রাহ্মভক্ত সমবেত হয়েছেন। পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ও ব্রহ্মনাম কীর্তনের মধ্যে হরিনামগানের অমৃতধারায় দিনটি বয়ে চলেছে। তার উপর রামকৃষ্ণকে পেয়ে সকলে আরও আনন্দিত। উৎসব আরম্ভে কেশবচন্দ্র গুরুগম্ভীর উপাসনা করলেন। ভাব-বিহ্বল হয়ে রামকৃষ্ণ সেই হৃদয়দ্রাবী প্রার্থনা শুনলেন। তারপর জলযোগ অন্তে সকলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে বসলেন, তাঁকে ঈশ্বর কথা বলতে অনুরোধ জানালেন।

"আপনি আমাদের কিছু বলুন।"

"আমি আর কি জানি গো। মা যা বলায় তাই বলি।" তারপর হঠাৎ বললেন ;—

"তোমরা এই যে নিয়মিত উপাসনা কর এ খুব ভাল। কিন্তু শুধু উপাসনা আর লেকচারে সব হয় না। ভোগাসক্তিকে দূর করার জন্য তাঁর পায়ে শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করতে হয়। তোমরা সংসারে আছ, সেখানেই থাক। সংসার ত্যাগ তোমাদের জন্য নয়। খাঁটি সোনা আর ভেজাল যেমন, কিম্বা চিনি আর গাদ, তোমরাও ঠিক তেমনি। আমরা মাঝে মাঝে এক রকম খেলা করি, তাতে সতেরো ফোঁটা জিততে হয়। আমি জেতার সীমা ছাড়িয়ে গেলাম, তাই হেরে গেছি।...কিন্তু তোমরা চালাক মানুষ, বেশী ফোঁটা জেতনি তাই এখনও খেলে যেতে পারছ। সত্যি, সংসারে থাক আর যেখানেই থাক, যতক্ষণ ভগবানের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ থাকবে, ততক্ষণ কিছুই যায় আসে না।"

সংসারে থেকে সংসারকে ঈশ্বরের মন্দির বানিয়ে তাঁকে ভজনা করে লাভ করতে হবে 'বৈরাগী' কেশবচন্দ্রেরও এই বিশ্বাস। এই উপলব্ধি। রামকৃষ্ণের কথা শুনতে শুনতে কেশবচন্দ্র ভাবেন তাঁর মনের ভাবনা,—"সংসার ব্রহ্মময়।" কিছুকাল আগে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে তাঁর প্রার্থনায় তিনি বলেছিলেন—

"* * * *ঈশ্বর, সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত্ত না হই, কিন্তু সংসারের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে পারি। তোমার কৃপাগুণে যেন সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইহার মধুই পান করি। যখন সংসার তোমারই হস্তের ব্যাপার তখন আমার ভয় কি? যখন তোমাকে দেখি, তখন সংসারের যেদিকে নেত্রপাত করি, সেদিকেই ব্রহ্মবিদ্যা। চারিদিক হইতে তখন তোমার ধর্মতত্ত্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি, তোমারই মন্দিরে আছি। তোমারই সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম সাধন করিতে পারি, কৃপাময়, এই আশীর্বাদ কর। নাথ, তোমার সাধকের কাছে সংসার কি। সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়।

*    *    *    *

ব্রাহ্ম বলিয়া যদি কাছে ডাকিয়া থাক, সংসারী হইয়াও যেন বৈরাগী হই এই

আশীর্বাদ কর। হে নাথ, সংসারে তোমার আজ্ঞা বহন করিব, লোকে বলিবে, এ ব্যক্তি সংসারে ডুবিয়া আছে, কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে দেখিব এবং তোমার কথা বলিব। প্রাণ মনকে তুমি অসার বস্তুদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ বটে, কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহা সার, তাহা লইয়া তোমার স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করিব। হে দীনশরণ, এই আশা করিয়া বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে প্রণাম করিতেছি।"[১]

রামকৃষ্ণ পরে আরও বললেন, "তোমরা নিরাকার সাধন কর সে খুব ভাল কথা। নিরাকার আর সাকার সবই সত্য। ঠিক ঠিক যে পথে যাবে ঈশ্বরকে পাবেই। আসল হল অনুরাগ, ভক্তি, সত্যপরায়ণতা। যে সম্প্রদায়ের লোক হোক না কেন ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, সেই ঈশ্বর ভক্তদের জাত গোত্র সব এক।"

ঈশ্বরের নিরাকার রূপ ও সাকার রূপের তাৎপর্য সম্পর্কে পরম জ্ঞানী রামকৃষ্ণ অবহিত ছিলেন একথা বলা বাহুল্য, কিন্তু এ কথাও মনে হয় ঠিক যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মিলনের পরই তিনি নিরাকার তত্ত্বে আরও আগ্রহী হয়েছিলেন। জীবনের সাধনা দিয়ে জীবন-আদর্শকে মূর্ত করে তিনি কেশবচন্দ্রকে সাকার নিরাকারের রহস্য বুঝিয়েছিলেন। অবশ্য সাকার নিরাকারের ভেদ কেশবচন্দ্রের কাছে যে অজানা ছিল তা মোটেই নয়। সাকার তত্ত্ব ও নিরাকার তত্ত্ব নিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বহু আলাপ-আলোচনা ও বোঝাবুঝি হয়। কেশবচন্দ্রের নিরাকার সম্বন্ধীয় ধারণা তিনি তাঁর "নিরাকারের রূপ" নামক উপদেশে পরিস্ফুট করলেন। "ব্রহ্ম অজড় নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই। তিনি মনুষ্যের ন্যায় হস্তপদ চক্ষু কর্ণাদি বিশিষ্ট নহেন। অথচ তাঁহার রূপ আছে। তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার স্বরূপই আকার। ব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপ সরস্বতী। সকল দেশেই পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব। বহুসংখ্যক লোক সাকার দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি কিরূপে হইল? ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ হইতে, এক এক সাকার দেব দেবী কল্পিত হইয়াছে। সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া, সুবিধার জন্য বা ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে একটি সাকার দেব বা দেবী কল্পনা করিয়াছে। ব্রহ্ম কখনও জড় নহেন, তিনি এক অভিন্ন, বহু নহেন, কিন্তু তিনি এক হইলেও তাঁহার তেত্রিশে কোটি রূপ অর্থাৎ অসংখ্য রূপ।"[২]

নানারকম সরস কথাবার্তা আরও কিছুক্ষণ চলল—সব কথাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। শেষে সকলে মিলিত কণ্ঠে গান গাইলেন। তারপর রামকৃষ্ণ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কেশব তাঁকে ধরে যত্ন সহকারে গাড়িতে তুলে দিলেন।

১ প্রার্থনা, ৮, ১১, ১৮৭৪।
২ ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ, ৩, ৭, ১৮৮০

ভাদ্রোৎসবের অল্পদিন[১] পরই কেশবচন্দ্র কলুটোলায় নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে রামকৃষ্ণকে আবার আহ্বান করে নিয়ে এলেন। সমাজের প্রতি উৎসবে রামকৃষ্ণ উপস্থিত না থাকলে কেশব যেন তৃপ্তি পান না। তাঁর উপস্থিতি যেন উৎসবের এক অঙ্গ।

উৎসব আরম্ভে রামকৃষ্ণকে ঘিরে সমবেত কণ্ঠে আনন্দ সঙ্গীত গাওয়া হ'ল। তারপর কেশবচন্দ্র উপাসনা আরম্ভ করলেন। উপাসনায় জলদগম্ভীর ভাবগদগদ কণ্ঠে বললেন, "হে ঈশ্বর, এই কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে ডুব দিতে পারি আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি।"

পুর মহিলারা চিকের আড়ালে বসে প্রার্থনা শুনছেন। রসিক চূড়ামণি রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে কেশবচন্দ্রকে বললেন,

"ওগো, একেবারে সবাই ডুব দিলে হবে কি করে? তাহলে এ'দের (মেয়েদের) দশা কি হবে?" বলে আঙুল দিয়ে চিকের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারপর বললেন—

"এক একবার আড়ায় ওঠ আবার ডুব দিও, আবার ওঠ"—।"[২]

কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য সবাই রামকৃষ্ণের কথায় হেসে উঠলেন, বুঝলেন রামকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন। একবার ডুব দাও. আবার ওঠ—সংসারে থাক, কিন্তু মাঝে মাঝে ভক্তি নদীতে অবগাহন করে নাও। এই ভাবে ভালবাসার কোমল পরশ বুলিয়ে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের উপলব্ধিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন।

—"এও কর, ওও কর। সংসার কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। তোমরা মনে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে।"

কেশবচন্দ্র হেসে বললেন, "উনি এখন দুই কর বলছেন। একদিন কুটুস করে কামড়াবেন।"

রামকৃষ্ণ শির আন্দোলিত করে কথার উত্তরে বললেন, "কামড়াব কেন গা?" তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন "তোমরা সংসারে আছ, তোমাদের সৎসঙ্গ দরকার। আগে সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা।"

রামকৃষ্ণ কথা বলছেন, নয়ন নিমীলিত। একাগ্র মনে সকলে শ্রবণরত।

—"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন।"

কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, "ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বছর আগেই হিস্যে ফেলে দেয়।"

একটু থেমে আবার বললেন, "মা রাধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে

---

১ ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৪র্থ ভাগ), ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯৪।

চুসি দিয়ে গেছে : যখন চুসি ফেলে চিৎকার করে ছেলে কাঁদে তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়।"[১]

কেশবের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বুঝলে গো, এমনি করে চুসি ফেলে কাঁদতে হবে, এরই নাম ব্যাকুলতা।" কথার সরসতায় ও প্রাঞ্জলতায় সকলে মুগ্ধ হ'ল।

কেশবচন্দ্রও তো অমন করে চুসি ফেলে কাঁদতে চান।

"সংসারী ঈশ্বর, সংসার টংসার তুমি কর গিয়ে। আমাদের বয়ে গিয়েছে সংসার করতে। আমরা কেবল প্রাণমধ্যে তোমার পাদ-পদ্ম পূজা করব।"

কথার মধ্যে রামকৃষ্ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিয়ে গান ধরলেন :—

"মন একবার হরিবল, হরিবল, হরিবল।
হরি হরি হরি বলে, ভবসিন্ধু পারে চল।
জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল।"—

গানটি গেয়ে, শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাব-সমাধি ঘটল। অপূর্ব ভাববিহ্বল মূর্তি—সকলে মোহিত হয়ে দেখছে। রামকৃষ্ণ ইষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। নয়নদ্বয় অর্ধনিমীলিত। ওষ্ঠে শোভাময় স্বর্গীয় হাসি। অবয়ব জুড়ে এক জ্যোতির্ময় ভাব!

বোধ হয় আগে থেকেই ঠিক ছিল যে সমাধি অবস্থায় রামকৃষ্ণের একটি ছবি তোলা হবে। উনি তো আবার ছবিটবি তোলাতে নারাজ। সজাগ অবস্থায় ছবি তুললে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন। কাগজে নাম ছাপা হলে তাতেই কত বিরক্তি! তাই ঠিক হয়েছে সমাধি অবস্থায় ওঁর 'ছবি' তোলা হবে।

কেশবচন্দ্রের নির্দেশে ব্রাহ্মভক্তরা সকলে সমাধি মগ্ন রামকৃষ্ণকে মধ্যে দণ্ডায়মান রেখে বসে রইলেন। হৃদয় সমাধিস্থ রামকৃষ্ণকে ধরে রাখলেন। ফটো নেওয়া হল। এটিই সম্ভবত রামকৃষ্ণের প্রথম ছবি।[২]

ছবি তুলে নেওয়ার পর প্রণব মন্ত্রোচ্চারণ করে রামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হল। কেশব জানালেন, "আমাদের সঙ্গে আমরা আজ আপনার ছবি তুলেছি।"

"সে কি, কেন এসব আবার কেন। এই খোলটার ছবি নিয়ে কি হবে।"—

কেশব বললেন, "আমরা চাই আমাদের অভিলাষ।"

এরপর আর কথা নেই। আমরা তোমায় ভালবাসি, সেই ভালবাসার জোর। তার উপর কোন কথা খাটে না। রামকৃষ্ণই তো বলেন, ভালবাসায় কৃষ্ণ গোপীদের কাছে বাঁধা ছিলেন।

প্রায় জন পঁচিশেক ব্রাহ্মভক্ত রামকৃষ্ণকে ঘিরে আছেন আর একপাশে কেশবচন্দ্র অন্য পাশে হৃদয়। রামকৃষ্ণের ভাব বিহ্বলতা দেখে সকলের চোখে মুখে অপার

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৪।

২ এই ফটোগ্রাফ থেকে পরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিলিপি নেয়।

—আচার্য কেশবচন্দ্র (মধ্য বিবরণ), —উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়
১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৪৭০

বিস্ময়, অঙ্গে রোমাঞ্চ ! তাঁর ঈশ্বর প্রেমমত্ততায় সকলে মুগ্ধ। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব এর আগে তাঁরা কারো মধ্যে দেখেনি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ঃ—

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্যনির্বৃতা ঃ ॥"

—"ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখনও রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন। কখনও তাঁর নাম গান করেন, কখনও তার গুণ কীর্তন করতে করতে অশ্রু বিসর্জন করেন।"

আজ রামকৃষ্ণের ব্যবহারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তের, এই লক্ষণগুলি লক্ষিত হ'ল। তিনি ঈশ্বর দর্শন, যোগ ও প্রেমের গভীর কথা বলতে বলতে এবং ভক্তিগীতি গাইতে গাইতে কতবার প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত ও উন্মত্ত প্রায় হলেন, কতবার ভাব-সমাধি মগ্ন হয়ে জড় পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট হলেন, কত হাসি হাসলেন, কত কান্না কাঁদলেন, নৃত্য করলেন বিমলনন্দে সুরামত্তের মত, শিশুর মত ব্যবহার করলেন।

সেই প্রমত্ত অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা বলে সকলকে চমকিত করলেন। বাস্তবিক তাঁর স্বর্গীয় ভাব দর্শনে রোমাঞ্চ জাগে অঙ্গে কাঁপন লাগে হৃদয়ে প্রাণে পুণের সঞ্চার হয়। পাষণ্ডের পাষণ্ডতা নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হয়ে যায়।[১]

সকলের প্রাণমন মাতিয়ে রামকৃষ্ণ সেদিন ফিরে গেলেন।

---

[১] এই বর্ণনা কেশবচন্দ্র সে বছরের "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় লিখে প্রকাশ করেন।
—আচার্য কেশবচন্দ্র ( অন্ত বিবরণ ), —গৌরগোবিন্দ রায়, পৃঃ ১৪৩৯

শরৎকাল, দেবীপক্ষ। আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ। পূজা অনুষ্ঠান না করলেও ব্রাহ্মরা এ সময় সমাজে শারদীয় উৎসব অনুষ্ঠান করেন।

কেশবচন্দ্রের বাড়ি 'কমল কুটিরে' তারই উদ্যোগ হচ্ছে।[১]

দেখা হলেই রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে বলেন, "তোমার জন্য মন ব্যাকুল হয়, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে প্রাণে শান্তি পাই। তুমি বড় দেরি করে আস।"

কেশবচন্দ্র তাই মহাষ্টমীর পুণ্যদিনে রামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ব্রাহ্মরা দুর্গাপূজা করেন না। তবে মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমীতে কেশব সকলকে নিয়ে প্রগাঢ় উপাসনা করেন। উপাসনা অন্তে সমবেত ভক্তজনের মধ্যে দুর্গাপূজার ব্যাখ্যাও করেন।

রামকৃষ্ণের ভক্ত মণি একবার দুর্গাপূজার ছুটিতে কেশবচন্দ্রের বাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি সে সময়ে দেখেছিলেন কমলকুটিরে প্রত্যহ সকাল দশটা এগারোটা পর্যন্ত প্রার্থনা করা হ'ত।

কেশব বলতেন, "...যদি মা'কে পাওয়া যায়, যদি মাকে কেউ হৃদয় মন্দিরে আনতে পারে তবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি এ সব আপনি হয়ে যায়—মা যদি আসেন।"[২]

রামকৃষ্ণ মণির কাছ থেকে এ সব শুনতেন। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা বা উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। উনি লোকমুখে কেশবের সব খবর নেন আর আনন্দে হাসেন। নিরাকার-সাধক ব্রহ্মানন্দ কেশব সাকার নিরাকারের রহস্য বুঝছেন।

কেশবচন্দ্র যেমন রামকৃষ্ণকে বুঝেছেন অন্যরা তার কিছুই বোঝেনি। রামকৃষ্ণ তা বুঝতে পারেন, তাই ব্রাহ্মভক্তদের মাঝে মাঝে বলেন,

"আমি আমার কথা বলে যাই, তোমরা যেমন হোক ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে বুঝে নিও।" কারণ তিনি ভাল করেই জানেন যে শিক্ষা ও পরিবেশে মানুষের মনের গঠন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। তাছাড়া জোর করে কাউকে কিছু বিশ্বাস করান যায় না। সবাই সব জিনিস ধারণা করতে পারবে তাও নয়। তবে একটা গানের সুরধ্বনি জাগলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গঠনের লোকের মনে নানা রূপ ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। যে সুর তাল ভাল বোঝে, সে রস ভালভাবে অস্বাদন করে, সে

১ অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৩য়), ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২৯।

সমঝদার সে একরকম আস্বাদন করে, যার তাল লয় জ্ঞান নেই সেও ও গানের সুরে মেতে 'উঁহু', উঁহু' করে—এও তেমন আর কি।[১]

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে ইতিপূর্বে একদিন সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। নিরাকার সাধনা নিয়ে এর আগে রামকৃষ্ণ খুব বেশি আলোচনা করেন নি। ইদানিং যে কারণেই হোক তিনি নিরাকার সাকার তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছেন।

ব্রাহ্মভক্তরা রামকৃষ্ণকে ঘিরে বসলে কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি বললেন, "আমি মাটির বা পাথরের কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালী। যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন কালী অর্থাৎ যিনি কালের সঙ্গে রমণ করেন। কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম।"

ক্ষণ বিরতির পর কেশবচন্দ্রকে ইঙ্গিত করে পুনরায় বললেন, "কিরকম জান; যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কূল-কিনারা নেই, ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখনও কখনও সাকার রূপ লয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্মজ্ঞান সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপটুপ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি মুখে বলা যায় না, মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।[২]

ঈশ্বর সাকারও আবার নিরাকারও। রামকৃষ্ণ তাঁর অতুলনীয় বাকভঙ্গীমায় এ কথা বোঝাচ্ছেন :—

"যে লোক একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জানতে পারে। যে নিরাকার জানতে পারে সে সাকারও জানতে পারে। যে পাড়াতেই গেলে না, কোনটা শ্যামপুকুর কোনটা তেলিপাড়া জানবে কেমন করে?" কথা শেষে মৃদু হাসলেন তিনি।

নির্বাক হয়ে রামকৃষ্ণের কথা শুনছেন কেশব—যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সত্যকে একনিষ্ঠ সাধনায় লাভ করা দরকার। তবেই সব কিছু জানা যাবে। সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার দূর হয় আর সব দৃশ্যমান হয়, তেমনই সত্য-সূর্যের উদয়ে মিথ্যার তমসা জাল

---

১ রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পান নি বা মেশেন নি। মথুরামোহন নব্য আলোক প্রাপ্ত হলেও অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা ও শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু হওয়ায় তিনি খুব শীঘ্রই রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের নব্য ভাবের ভাবুকদের সংস্পর্শে আসায় পূর্বে রামকৃষ্ণ বেশ কিছুকাল কঠোর সাধনা করেন এবং এ পর্যন্ত তাঁকে এমন মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে হয় যারা সাধারণ না হ'লেও গোঁড়া হিন্দু।

রামকৃষ্ণ যখন এই ইংরাজী শিক্ষিত মানুষদের সংস্পর্শে এলেন যাদের বিচারবুদ্ধি গতানুগতিক নয়, তখন তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। তাঁর ভাবের আদানপ্রদান রীতিকে তিনি সংযত ও প্রয়োজনানুগ করলেন। কিভাবে কথা বললে এদের প্রতীতি জন্মাবে এ জেনে তিনি অনুরূপ ব্যবস্থা নিলেন।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম)—২য় সংস্করণ।

ছিন্ন হয়ে জীবন জগৎ আলোকিত হবে, সব কিছু বোঝা যাবে ; সবাই তো নিরাকার ভাবে ঈশ্বর ভাবনা ভাবতে পারে না। তাই সাকার ভাবের সাধনার বিশেষ প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ এখন একথা বোঝাচ্ছেন :—

"এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানা রকম আয়োজন করেছেন, যার পেটে যা সয়। কারো জন্য মাছের পোলাও করেছেন, যার পেটের অসুখ, তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়॥"

উপমার কি সরল সৌন্দর্য ! দুর্বোধ্য ভাবের অপরূপ সহজীকরণ !

এবার কীর্তন হবে—তারই আয়োজন চলছে। অনেক ভক্ত কীর্তনে যোগ দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে,—ব্রাহ্ম হিন্দু, অনেকেই। রামকৃষ্ণ গান ধরলেন—

"হরিনাম নিসরে জীব যদি সুখে থাকবি।
সুখে থাকবি বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি॥
( হরিনাম গুণেরে )
যে নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে
আজ সেই হরিনাম দিব তোকে।"

মধুর কণ্ঠে গান গাইলেন তিনি—সঙ্গে সবাই গাইছে। কেশবচন্দ্রও ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বেহুশের মত হয়ে পড়েছেন। রামকৃষ্ণ গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সমাধিস্থ হলেন।

সমাধি ভাঙ্গলে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, নয়ন নিমীলিত, কোন গভীর গহন থেকে যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—

"ভজনানন্দ ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা—প্রেমের সুরা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞান বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন।"

হাঁ, ভালবাসা—রামকৃষ্ণ নিজেই তো ঘনিভূত প্রেম। এই ঈশ্বর প্রেমের আস্বাদনে কতবার কেশবের হৃদয় বিবশ হয়েছে। ঈশ্বর-প্রেমের কথা বলে, ঈশ্বর-প্রেমের পরশ পেয়ে তাঁর অন্তর কতবার গভীর আনন্দে শিহরিত হয়েছে।

সেই ভালবাসার কথা তিনি প্রিয়জনকে জানিয়েছেন ; —"যদি ভালবেসে দশ জনের ভার নিতে তবে ভালবাসা কেমন মিষ্ট ও পবিত্র বুঝিতে পারিতে। যদি তোমরা চারিজন স্বর্গীয়ভাবে পরস্পরকে ভালবাসিতে, তোমাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহা জগৎ চিনিতে পারিত। ভালবাসাতে সমতার আবশ্যক নাই। ৮০ বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে। আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবাসি তিনি কি আমাদের সমান ? ঈশ্বরকে ভালবাসি এই জন্য যে তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন। কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন ততক্ষণ তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। ......যথার্থ ভালবাসা সম্পর্ক জাত। মা কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন ? সম্পর্কের ভালবাসাতে তোমরা বাঁচিবে। মানব ভাই, ব্রাহ্ম ভাই, সমবিশ্বাসী ভাই, সম-উপাসক ভাই, প্রচারক ভাই এই পাঁচটি সম্পর্কের সমষ্টি কত মিষ্ট।"[১]

[১] সাধন ও তপোবন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ১৪. ৯. ১৮৭৬।

এত গেল ভালবাসতে বলা। প্রেমের মিষ্টতা বুঝে অন্যকে সেই মিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করতে বলা। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমে আকুল হয়ে কেশব যখন বলেন—

"...সুখ কি পেয়েছি! তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে আমার কালো ঠোঁট সিঁদুর হয়ে গেল। আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব! তোমার প্রেমখানা ভারি কোমল, ফুলগুলোও টিপলে বোধহয় যেন পাথর তোমার প্রেমের তুলনায়। হে পুণ্যময় জগদীশ! ইচ্ছা হয় দৌড়ে গিয়ে গায়ে হাত দি তোমার। কেন এমন সুন্দর হয়ে এলে? আপনার মুখ আপনি আঁক, এ বেদেও নাই, কোরানেও নাই।"—তখন জগদীশ তাঁর হৃদয় দেউলে বিরাজিত।

কথার ফাঁকে হঠাৎ রামকৃষ্ণ শিশুর মত বলে উঠলেন, "আচ্ছা আমি কোন পথের।"

হেসে উত্তর দিলেন কেশব, "আপনি আমাদেরই মতের, নিরাকারে আসছেন।"[১]

কথা শুনে রামকৃষ্ণ হেসে ফেললেন।

রামকৃষ্ণ সকলের, সব মতের—সব পথের।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৪র্থ ভাগ), ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১৪৫।
পরবর্তীকালে শশধর বলেছিলেন "ইনি আমাদের"। আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন, "আপনি আমাদের মতের লোক."

কোজাগর পূর্ণিমা আজ—লক্ষ্মী পূজা।[১] সুন্দর রৌদ্রস্নাত দিন। ঘড়িতে দুপুর একটা। সূর্যদেব মধ্যগগন থেকে পশ্চিম দিকে কিছু হেলে পড়েছেন। বাতাস বইছে মৃদুমন্দ। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বিশ্রাম করছেন। হৃদয় তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় ওঁরা শুনতে পেলেন ভাগীরথী বক্ষ হতে কীর্তন গান ও খোল করতাল ধ্বনি ভেসে আসছে।

"হৃদু! কেশব আসছে রে!"—সঙ্গীত ধ্বনি শোনা মাত্র রামকৃষ্ণ শিশুর মত আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন ;—

"ওরে যা, শীঘ্র যা, ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আয়—যা, যা।" কীর্তনের ধ্বনি শুনে ঠিক বুঝেছেন কেশবের দল ছাড়া ওরা আর কেউ নয়। কেশবচন্দ্রের জন্যই তো তিনি আশায় আশায় বসে আছেন।

প্রায় আশীজন ব্রাহ্মভক্তকে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গাবক্ষে নামযাত্রায় বেরিয়েছেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে দক্ষিনেশ্বর আসছেন। সকলে রয়েছেন একটি বজরা, ছটি নৌকা এবং দু'খানা ডিঙ্গায়। এক বিরাট ব্যাপার। কেশবের ব্রাহ্মবাহিনী। আশীজন যাত্রী তার মধ্যে বারোজন ব্রাহ্মিকা। বজরার শীর্ষদেশে পতাকা উড়ছে তাতে লেখা—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। একমেবাদ্বিতীয়ম্। সত্যমেব জয়তে।" জলযানগুলি পুষ্প-পল্লব শোভিত। খোল বাজছে, করতাল বাজছে, ভেরী বাজছে। কর্ণকুহরে দূরাগত সঙ্গীত ধ্বনি এসে পৌঁচচ্ছে।

কেশবচন্দ্র ও অন্যান ব্রাহ্মরা ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। হৃদয় ওঁদের অভ্যর্থনা করে আনতে এগিয়ে গেলেন। ওখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে তিনিও কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন ;

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে,<br>
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।<br>
নইলে কেন তাপিত পরাণ শীতল হতেছে,<br>
হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে।"

গান গাইতে গাইতে পঞ্চবটী থেকে রামকৃষ্ণের কাছে সকলে উপস্থিত হলেন। কীর্তন শুনে প্রাণ দুলে উঠেছে রামকৃষ্ণের। তিনিও কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন ;—

"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ আনন্দ ঘন<br>
( মন মজিল রে, রূপ নেহারিয়ে )<br>
এরূপ প্রেমিকের প্রাণ রমণ।"

সঙ্গীত লহরী বাতাসে বাতাসে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ সমাধি

১ ২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

মগ্ন হচ্ছেন আবার চেতনা লাভ করে সঙ্গীতানন্দে মেতে উঠছেন। অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য। এইভাবে ঈশ্বরের নামকীর্তনে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল। তারপর ঈশ্বরের গান থামল—সকলে মুখহাত ধুয়ে কিছু আহার করলেন। রামকৃষ্ণ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "আজ বড় আনন্দ পেলুম। ভবতারিণী বড় আনন্দ দিলেন।"

কেশবচন্দ্র একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন আর ভাবছেন, 'ইনি যেন রক্তমাংসের মানুষ নন, ঘনিভূত ঈশ্বর প্রেম'।

সন্ধ্যার পর সবাই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে মন্দিরের বাঁধা ঘাটে গিয়ে বসলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, "কেশব প্রার্থনা কর, শুনি।"—

চন্দ্রকরোজ্জ্বল উছল-ঢেউ ভাগীরথীর দিকে চেয়ে আছেন ব্রহ্মানন্দ কেশব। অনির্বচনীয় ভাবাবেশে মন তার পূর্ণ। বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। হাতদুটি অঞ্জলিবদ্ধ করে উর্ধাকাশে দৃষ্টি মেলে গভীর অথচ মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

—"ভক্তগণ, ভক্তির সঙ্গে আজ একবার পূর্ণচন্দ্র দেখ। কার চন্দ্র? আমার হরির চন্দ্র। আমাদের প্রাণের হরি আকাশে চাঁদ ধরে বসে আছেন। ভুবন মোহন হরি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভেতর থেকে ভক্তের মন মজাচ্ছেন। হে চন্দ্র, আজ তুমি পূর্ণ মাত্রায় জ্যোৎস্না বিতরণ করছ। তোমাকে দেখে আজ জীবের কত আহ্লাদ হচ্ছে। আজ তুমি জাহ্নবীর শোভা দশগুণ বৃদ্ধি করলে। আমার প্রাণের হরির চন্দ্র, সুধার আধার, তুমি আমার কালো হৃদয়কে সুন্দর করলে! চন্দ্র, তুমি যাঁর চন্দ্র তাঁকে দেখিয়ে দাও। তুমি ভক্তির চন্দ্র প্রেমচন্দ্র হও। যাঁর প্রেমমুখ দেখলে ভক্তের হৃদয় চোখের জলে ভাসে, যাঁকে স্মরণ করে ভাগবৎ চৈতন্যের প্রেম উথলিত হত, সেই মা জগজ্জননীকে তুমি দেখিয়ে দাও। আজ ঈশ্বর কোথায়? যথার্থই জগজ্জননী আমাদের কাছে বসে আছেন। ভক্তগণ তোমরা সেই মার ক্রোড়ে বসে রয়েছ।

ভুবনমোহিনী মার রূপের সঙ্গে এই পূর্ণিমার চন্দ্রের তুলনা হতে পারে না। তাঁর পায়ের তলায় এমন কোটি কোটি চন্দ্র গড়াচ্ছে। সেই মা, বন্ধুগণ আমাকে ভালবাসেন। পৃথিবীর মা অপেক্ষাও তিনি আমাদের সহস্র গুণে ভালবাসেন। হে চন্দ্র, হে ভাগীরথি, তোমরা বলনা, আমাদের সেই চিদানন্দময়ী মা কোথায়? মা তার অমৃত নিকেতনে আমাদের জন্য কত সুখরত্ন সঞ্চয় করে রেখেছেন। জীব তরাবার জন্য মা তার স্নেহের ভাণ্ডার খোলা রেখেছেন।

ভক্তগণ, এখন একবার গঙ্গার প্রতি তাকিয়ে দেখ। গঙ্গা কেমন আনন্দের সঙ্গে হরির শ্রীচরণ ধুইয়ে দিচ্ছে। হিমালয় থেকে বের হয়ে গঙ্গা কত শত ক্রোশ অতিক্রম করে এখানে আসছে। গঙ্গা নিঃস্বার্থ ভাবে জমিদার, কাঙ্গাল সকলেরই সেবা করে, সকলকে ধৌত করে, সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, সকলকেই জল দেয়। লক্ষ লক্ষ কলস জল উঠছে তবুও গঙ্গার জল ফুরায় না।

ভক্ত তুমি এই নদীর মত হ'ও। গভীর প্রশান্ত জল ফুরায় না। পৃথিবীর সামান্য জ্ঞানের জল শুকিয়ে যায়। কিন্তু হরি ভক্তের প্রেমের জল শুকায় না। ভক্ত, তোমার প্রাণের ভিতর একদিকে যেমন সর্বদা প্রেমচন্দ্র উদিত থাকবে, অপর দিকে যেন সর্বদা ভক্তি-জাহ্নবী বইতে থাকে। ভক্ত যে তাঁর নিজের হৃদয়ে কি সুধারস আস্বাদন

করেন তা কেবল ভক্তই জানেন। দয়ার চন্দ্র প্রেম-জলধি যিনি, তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করলে কি আর সুখের সীমা থাকে? চারদিকে কেমন সুন্দর দৃশ্য!! আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র নীচে একটানা গঙ্গা, গঙ্গার দুই দিকে নানা প্রকার বৃক্ষলতা ও ধান্যক্ষেত্র। এ সমস্ত শারদীয় উৎসবের অনুকূল।

মা জগজ্জননী, এস কাছে এস, আর কেন বিলম্ব কর? মা তোমার প্রেমনদীতে আমাদের ডুবিয়ে দাও। মা, তোমাকে প্রাণভরে দেখব, আর হাসব, কাঁদব, গাইব, নাচব, আর মনে আনন্দ ধরবে না। মা, তোমার ছেলেদের সকল পাপের বন্ধন কেটে দাও। আর সংসারে ডুবব না। জননীর কাছে বসে সকলে মিলে খুব আনন্দের সঙ্গে জননীর পূজা করব।

মা তুমিত সুন্দর আছই কিন্তু তোমার ভক্তেরা যখন তোমার পূজা করেন, তখন বিশেষ রূপে তোমার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

মা, তোমার মনের সাধ যে তুমি জীব তরাবে। তোমার সাধ তুমি মিটাও। এসেছ জননি, আমাদের নিকটে বস। আমাদের মস্তকের উপর তোমার মঙ্গল হস্ত স্থাপন করে আশীর্বাদ কর যেন চিরকাল, হে করুণাময়ী ঈশ্বরী, আমরা তোমারই থাকি।"—

কেশবচন্দ্র প্রার্থনা শেষ করলেন। ভাবের তরঙ্গ চতুর্দিকে তরঙ্গায়িত হতে থাকল। কেশব যখন প্রার্থনা করেন তখন মনে হয় তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তর হ'তে কোন উজ্জ্বল আলোক-ধারা শব্দের কম্পনে কম্পিত হয়ে নির্গত হচ্ছে। যার কানে সেই ধ্বনি জাগে তাকে মন্ত্র মুগ্ধ করে দেয়। কেশবচন্দ্রের বলার ভঙ্গিমা কি মনোহর, কি অপরূপ! প্রার্থনা কত মর্মস্পর্শী, কতখানি আকুলতা কথার মধ্যে! মাতিয়ে দেয় মানুষকে। ধন্য কেশব। "ভগবানের কৃপা না হলে এমনটি হয় না"—রামকৃষ্ণ বলেন।

ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ কেশব।

রামকৃষ্ণ রুদ্ধ গলায় বললেন, "বেশ লাগলো গো, তোমার প্রার্থনা শুনতে শুনতে ভাব এসে গিয়েছিল।"

কথা শুনে কেশবচন্দ্র মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

কিছুক্ষণ পর গভীর শান্তস্বরে রামকৃষ্ণ বললেন, "তোমরা বল, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান।"

সকলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চরোলে বললেন,

"ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান।"

রামকৃষ্ণ বললেন, "বল, ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জগৎ।"

রামকৃষ্ণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই বললেন, "ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জগৎ।"

রামকৃষ্ণ এবার বললেন, "বল, ভগবৎ, ভক্ত, ভগবান।"

সকলে বললেন—"ভগবৎ, ভক্ত, ভগবান।"

চন্দ্রালোক বিধৌত ভাগীরথীর জলে রামকৃষ্ণ, কেশব ও অন্যান্যদের ভক্তিভাবে উচ্চারিত মন্ত্রের কম্পন তরঙ্গায়িত হতে লাগল :—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান।
ব্রহ্ম, মায়া, জীব, জগৎ।
ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান।

ঐ তরঙ্গের মধ্যে রামকৃষ্ণ আবার বললেন,—

"এবার বল, গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব।"

তখন কেশবচন্দ্র আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন, "না মশাই, এখন অতদূর নয়। আমারা যদি গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব বলি লোকে আমাদের গোঁড়া বলবে যে। কথা শুনে রামকৃষ্ণও হাসতে লাগলেন, বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যতদূর পার ততদূর বল।[১]

মানব জীবনে এই এক সত্য। কোনও লোকসান নেই। যতটুকু ভগবানকে ডাকবে ততটুকুই তোমার লাভ। শুধু নিষ্ঠা থাকা চাই। যে পথেই যাও, যে ভাবেই তাঁকে ডাক, যতটুকু পূজার্ঘ্য অর্পণ কর,—তোমার ডাকার মধ্যে, অর্চনার মধ্যে যদি নিষ্ঠা থাকে তিনি তোমার মধ্যে ততখানিই প্রতিভাত হবেন।

কেশবচন্দ্র বললেন, "আরও ঈশ্বরের কথা হোক। আপনি মার কথা বলুন।"

ভাবের ঘোরে রামকৃষ্ণের চোখ দুটি হাসছে, প্রেমনয়নে চারদিকে চেয়ে গান ধরলেন ;—

"হরিনাম নিসরে জীব যদি সুখে থাকবি
সুখে থাকবি বৈকুণ্ঠে যাবি ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি।"

মুগ্ধ মনে সকলে সুললিত গীত শুনল। গানের চরণটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ হঠাৎ ভাব সমাধি মগ্ন হলেন। অধীর আগ্রহে সকলে ওর দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে তিনি নয়ন উন্মিলিত করলেন।—দৃষ্টি ওঁর যেন কোন সুদূরে চলে গেছে। কোন গভীর অতল হতে কথা ভেসে এল,—

"ঈশ্বরের নাম নাও ও আন্তরিক ভাবে তাঁর ভাবনা কর, সব পাপ দূর হবে। যেমন তুলোর পাহাড়, আগুনের, ক্ষণিক স্পর্শেই পুড়ে ছাই হয়। যেমন পাখি ; অনেক পাখি গাছে বসেছে যেই হাত তালি দিলে অমনি সব উড়ে গেল।" হাত তালি হল ভগবানের নাম নেওয়া আর পাখিগুলো দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা। তারপর কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, "মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি আর অরণ্যেই থাকি আমার বন্ধন কি ? আমি ঈশ্বরের সন্তান রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে ?"

"যদি সাপে কামড়ায় 'বিষ নেই, বিষ নেই', জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই', 'আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।"

রামকৃষ্ণ বলছেন, কেশবচন্দ্র তন্ময় হয়ে শুনছেন।

—"খ্রীষ্টানদের একখানা বাইবেল একজন দিলে। আমি পড়ে শোনাতে বল্লুম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ। যে লোক 'আমি বদ্ধ' বার বার এই কথা বলে সে শেষে বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী, আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়।"[২]

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম)—শ্রীম লিখিত।

কেশবচন্দ্রের পাপবোধ ভিন্নরূপ, কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছু বললেন না। নীরবে নতমস্তকে রামকৃষ্ণের কথাগুলি ভাবতে লাগলেন।

তাঁর 'জীবন বেদে' এই "পাপ বোধে"র কথা কেশব বলেছেন :—

"পাপবোধ আমার অনেক প্রবল, অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। ......চুরি, ডাকাতি, পরদ্রব্যহরণ ইত্যাদিকে পৃথিবীর অভিধানে পাপ বলে। যিনি তোমাদের নিকট এখন কথা কহিতেছেন, ইঁহার অভিধানে পাপ গ্লানি, পাপ ব্যাধি, পাপ অসুস্থাবস্থা, পাপ দৌর্বল্য, পাপ—পাপ করিবার সম্ভাবনা।

আমি পাপকে পাপ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি নাই, পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি। আভিধানিক অর্থ নিজে করি নাই, যখন বিবেকের আলো হৃদয়ে পড়িল দেখি শতাধিক, সহস্রাধিক ছোট ছোট বস্তু রহিয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, অনেক বস্তু আছে। জড়তা, দৌর্বল্য, আসক্তি, কতই হৃদয়ের ভিতরে। আত্মার মধ্যে সব এমনই প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, যে বিবেকের আলো না জ্বালিলে কিছুই দেখা যাইত না। এক এক দিন যেমন মন্দিরে গ্যাসের আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বিবেকের আলো তেমনি করিয়া হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। দেখি কেবলই পাপ। শরীর যখন আছে, কাম ক্রোধাদির মূলও আছে। এ কথা বলিতেছি বটে কিন্তু সে মত মানি না যে মতে পাপেই মানুষের জন্মে নির্দেশ করে।

* * * *

তুমি লেখা পড়া কম জান, আমি বেশী জানি এইরূপ মনে হইলেই পাপ। মনের ভিতর আপনাকে যদি অধিক ভালবাসি, অন্যকে ভালবাসা যদি কম হয়, আত্মসুখের প্রতি যদি অধিক দৃষ্টি পড়ে, তবেই স্বার্থপরতার পাপে পাপী হইলাম।

* * * *

এই স্বার্থপরতা হইল, তারপর এই অভিমান হইল, তারপর পরদ্রব্যে আসক্তি হইল, তারপর মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা হইল। তারপর টাকার প্রতি মত্ততা হইল, তারপর অন্য দশজনের অপেক্ষা নিজের সুখ চেষ্টা অধিক হইল। এই গণিতে গণিতে সন্ধ্যা হইল, রজনী হইল। শেষ আর হইল না।

এই পাপ গণনা বুদ্ধিগত নয়, হৃদয়ের গণনা। ইহাতে জ্বালা হয়। অন্তরে বুদ্ধি কেবল যে বলে, এত অহংকার ভাল নয়, এত স্বার্থপরতা অন্যায়। যুক্তিবাদীদের কথা আমার কাছে দুর্বল। সরল কথা কি? যেমনই পাপ বোধ অমনই কষ্ট জ্বালা। যেমন মাকড়সার প্রকাণ্ড জালে মাছি কোথাও পড়িলেই মাকড়সা অনুভব করিয়া ধরিতে পারে। জীবনের কোথায় কি একটা ভাবনা হইতেছে, কোথায় কি একটা কর্তব্য করা হয় নাই, কি করা উচিত ছিল অথচ অকৃত আছে, কোথায় ধর্মকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, জীবনের কোন স্থানে দুর্বলতা, চৈতন্যশীল মন ধ'া করিয়া দেখিতে পায়। দেখিলেই বলে, "কিরে! অন্ধকারে এই সব রহিয়াছে তবে তো ডাকাত হইতে পারি।" এই পাপের গণনা আরও কতদূর বিস্তৃত করিতে পারি। এ গঙ্গার মতন। সমুদ্রের মতন। মহা সমুদ্রের মতন।

* * * *

একে পাপ তার উপর আবার অবিশ্বাস। ভগবান কি এখানে? চৈতন্যের মুখ

কি দেখিতে পাইব? যেই এ কথা মনে হইল অমনই কে বলিল, "আরে অপরাধ! চৈতন্যের মুখ দেখিবে না? যিনি নাচিতেছেন গৌরাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে দেখিবি না? দোষীর তাহাতেই কষ্ট হইতে লাগিল। ঈশ্বর ছাড়িলেন না। এ সহর হইতে ও সহর, ও সহর হইতে এ সহর, দেখিতে দেখিতে শান্তিপুরে গিয়া শান্তি। ঘরে শান্ত হইলাম। বলিলাম জ্বালার শান্তি হইল।

রোগী না হইলে কি সুস্থতার মর্যাদা কেহ বুঝিতে পারে? দুঃখী না হইলে ধন লাভের যে কি সুখ, তাহা কি কেহ জানিতে পারে? কি সুখ যে হয় জ্বালা নিবৃত্ত হইলে তাহা আমি দেখিলাম।

* * * *

ব্রাহ্ম সমাজের শ্রেষ্ঠ পাপী, এই পাতকী, এই বেদিস্থিত ব্যক্তি। অলঙ্কার নয়, পদ্য নয়, যথার্থ কথা। নিজের মন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীতে অল্প অপরাধী আছে এমন। আমার কেবলই পাপ। অন্যের যাহা একটা পাপ, আমার নিকট পাঁচটা পাপ। অন্যের কাছে যাহা পাপ নয়, আমার কাছে তাহা পাপ।

* * * *

যদি কোন কথা একটু মিষ্টতাশূন্য বলিয়া থাকি অমনই কষ্ট হইতে থাকে। ...কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্যও অনুরুদ্ধ।

* * * *

তুমি বল ব্যাভিচার পাপ, কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি একটু আসক্তি দেখায়, অধিক স্ত্রী জাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি বলি কি ভয়ানক। তুমি বল চুরি পাপ, আমি বলি এত মুসার কথা। তুমি অধিক টাকা কড়ির বিষয় ভাব? কি ভয়ানক!

ধ্যানের সময় পাঁচ মিনিটের মধ্যেও সময় চুরি করিয়া তুমি ভাবিতেছ ছেলে কি খাবে? টাকা কিরূপে হবে? কি ভয়ানক!

* * * *

পাপ অপেক্ষা পুণ্য যে উৎকৃষ্ট ইহা তো জান। পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জ্বালা হয়,—তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন।

* * * *

বন্ধু! যেমন অন্ধকারের কথা বলিলাম, তেমনি আলোকের কথাও বলিলাম, যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক। যেমনি ছটফট করিবে অমনিই শান্তি দেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তি দান করিবেন।"[১]

পাপকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্যই কেশবচন্দ্রর পাপবোধ। এ এক নিজস্ব সাধনা তাঁর। আপনাকে পবিত্র করার সাধনা।

রামকৃষ্ণ তারপর মুক্তির সম্বন্ধে যে কথা বললেন সে কথা কেশবেরও মনের কথা। এ ভাবের কত কথা তাঁর প্রাত্যহিক প্রার্থনায় ফুটে উঠেছে।

"ঈশ্বরের নামে অটল বিশ্বাস হওয়া চাই," রামকৃষ্ণ বললেন, "কি? আমি তাঁর নাম

১ জীবন বেদ—আচার্য কেশবচন্দ্র সেন।

করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার বন্ধন কি? পাপ কি?" ক্ষণিক নীরব থেকে আবার বললেন;

"ভগবানের নাম কর। তাঁর নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এ সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি, তা আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

সবাই গভীর অভিনিবেশে কথাগুলি শুনল। বিশ্বাসে মিলে ভগবান, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস করে একবার তাঁর নাম কর, মনের সব মালিন্য ধুয়ে যাবে। তুমি মুক্ত হবে।

এমন আশার বাণী এত সহজ করে আর কে শুনিয়েছে? নদের নিমাইচন্দ্র বলেছিলেন, 'একবার প্রাণভরে 'হরি' বললেই পাপী, তাপী সব উদ্ধার পাবে',। তারপর বললেন রামকৃষ্ণ। আর কারও ভাবনা নেই। একটি বার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হ'তে বল, 'শিব', তুমি শিবই হয়ে যাবে। সংশয়-শঙ্কিত হৃদয়ে রামকৃষ্ণ এনে দিলেন মেঘ। মুক্ত নির্মল রৌদ্র করোজ্জ্বল মহাকাশ। তৃষ্ণার্তের কাছে অযাচিত অমৃতবারি। তাঁকে বিশ্বাস করে একবার বল, 'যা অন্যায় করেছি আর তা করব না'। শপথ নাও। কলুষহরণ ভগবান তোমার সর্বপাপ বিমোচন করবেন। তুমি মুক্তি পাবে তোমার ব্যাধি-পঙ্ক হতে পঙ্কজের সৌগন্ধে। তুমি যে তাঁরই সন্তান।

রামকৃষ্ণ সংসারের কাতর মানুষকে বরাভয় দিলেন—তৃষ্ণার্তকে অমিয়বারি। তারপর তিনি হিন্দু দর্শনের অনেক সার কথা বললেন। তিনি বললেন, "ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয় আর ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ॥[১]

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের এই কথা স্বীকার করলেন। রামকৃষ্ণ তারপর বললেন, "ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক আর একে তিন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন।"

একবার নীরব থেকে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন আবার, "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনে এক একে তিন।"

তিনিই এক—বহু হয়েছেন। তিনিই বহু এক হয়েছেন।

তদঐক্ষত বহুস্যাম প্রজায়েয়।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম ভাগ)—শ্রীম লিখিত।

# ১৩

চৈত্রমাস প্রায় শেষ হয়ে এল।[১] বেশ গরম পড়েছে। সকাল বেলা বাতাস বইছে মৃদু মৃদু এলোমেলো। কাছেই কোন বাড়ির পোষা এক কোকিলের ডাক মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। পিঞ্জরবন্দী পাখিটি ডেকে উঠেছে। মুক্তির জন্য বুঝি ওর ব্যাকুলতা।

কমলকুটিরের দ্বিতলে নিজের ধ্যানকক্ষে বসে কেশবও ভেতরে ভেতরে ছটফট করছেন। তাঁর প্রাণে জেগে উঠেছে তীব্র বৈরাগ্য। প্রাণ তাঁর কিছুদিন থেকেই ব্যাকুল। মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। সময় সুযোগ পেলেই রামকৃষ্ণের কাছে তিনি চলে যান। সেখানে যে প্রাণ তৃপ্তি পায়, মনের কথা ওঁর মত আর কেউ বলে না।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য দিন দিন কেশবচন্দ্রের ব্যাকুলতা বেড়ে চলেছে। মন চায় সদা ঈশ্বর যোগে যুক্ত থাকতে। একটু আধটু অনুভূতি তাঁর ভাল লাগে না। এক একবার মনে হয় সমাজ সংসার সব ত্যাগ করে চলে যান দূরে বহুদূরে যেখানে হয়ত সর্বসময় ঈশ্বর যোগে যুক্ত থাকতে পারবেন।

মনে মনে হাসেন কেশব। একি বিচিত্র ভাবনা তাঁর। মনই তো আসল, সে তুমি সংসারে থাক বা সংসারের বাইরে যাও। তাছাড়া পাত্রমিত্র প্রিয় পরিজন নিয়েই তো তাঁর ঈশ্বর সাধনা।

লোকমান্য? কই তাঁর তেমন কিছু লোকমান্য তো নেই? কিম্বা হয়ত আছে, মনের কোণে তাকে ধরা যাচ্ছে না। আসক্তি? না সংসারে তাঁর তেমন কোন আসক্তি নেই। আকাঙ্খা? হাঁ, মানুষের ভাল করার তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে, তীব্র আকাঙ্খা আছে ঈশ্বর দর্শনের। মানুষের মঙ্গল করার আকাঙ্খাকে কেশবচন্দ্র কোনভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এ জন্যই কি তাঁর লোকমান্য স্পৃহা, আশক্তি, আকাঙ্খা সমূলে উৎপাটিত হয় নি? বুঝতে পারেন না ব্রহ্মানন্দ কেশব। শুধু দেখেন এখানেই তার সমস্ত উপলব্ধি থমকে থামছে। আবার পাশ কাটিয়ে চলছে। যা কিছু তিনি করেন তা সবই ঈশ্বরের পানে চেয়ে, বিবেকের নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায়। প্রাণে যখন ঈশ্বরের আদেশ অনুভব করেন তখনই কেশব কর্মে উদ্যোগী হন—সে কাজকে তিনি ঈশ্বরেই কাজ মনে করেন।

তীব্র ধর্মীয় চেতনার প্রদীপ বালক কাল থেকেই তাঁর হৃদয়ে প্রজ্বলিত রয়েছে। ঈশ্বরকে জানবার ব্যগ্রতায় ভাল ছাত্র হয়েও বাঁধাধরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন। গতানুগতিক যুক্তি ও পাঠ্য বিষয় তাঁর ভাল লাগেনি। ব্যাঙ্কের উত্তম চাকুরি ত্যাগ করেছেন। সংসারে কোনও আসক্তি রাখেন নি, বিবাহ করলেও বিবাহিত জীবন বিষতুল্য বোধ হয়েছে। ধর্মের গোঁড়ামি ও নারী জাতির দুর্দশা তাঁর হৃদয় ব্যথিত করেছে। তাই তিনি সংস্কারের পথে আপনাকে নিবেদিত করেছেন।

১ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ মাস।

ব্যাকুল প্রার্থনায় অন্তরে তাঁর যখনই প্রত্যাদেশ এসেছে তখনই কাজে নেমেছেন। ভক্তির ফল্গুধারায় অবগাহন করেছেন, যুক্তিকে দূরে রেখেছেন, বর্জন করেন নি। কত বাধা পেয়েছেন, শত্রুতা করেছে কত লোকে, বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাঁর মতের, তাঁর কাজের। কত লোকে বিদ্বেষ পোষণ করেছে, কু'কথা বলেছে। যারা চলার পথের সাথী ছিল তাদের অনেকেই সঙ্গ ছিন্ন করেছে, স্বার্থপরতার বদনাম দিয়েছে। তবু কেশব তার আদর্শ ত্যাগ করতে পারেন নি। নব নব সত্যোপলব্ধিতে প্রাণকে আলোকিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, আপন উপলব্ধিকে আরও উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবেন নি কিন্তু নিজেকে দুর্বল অসহায় মনে করে নিজের সঙ্গে হঠকারিতাও করেন নি।

কেশবচন্দ্র আজ তাই তন্ন তন্ন করে জীবনের মিথ্যাচারকে খুঁজতে চাইছেন। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন কই? প্রাণ যে কেবল প্রাণের প্রার্থনাই করছে—

"হে দীনবন্ধু। সর্বক্ষণের জন্য তোমার যোগে আমায় যুক্ত কর। তোমার আলোকিত পথে তুমি আমায় পরিচালিত কর।"

অনেক দিন আগে। (২৯. ৯. ১৮৭৪) "অরূপ রূপ দর্শন—এযে আশ্চর্য কথা" এই আলাচনায় কেশবচন্দ্র তাঁর আচার্যের উপদেশে বলেছিলেন;—"সামান্য রূপ-দর্শন হইলে হইবে না, নিঃসন্দেহে দর্শন চাই, কেবল নিঃসন্দেহ দর্শন হইলেই হইবে না, সুমিস্ট দর্শন চাই, আবার কেবল সুমিষ্ট দর্শন হইলেও হইবে না কিন্তু পূর্ণ মত্ততার দর্শন চাই"—কেশবচন্দ্রের আজও সেই ভাবনা, সেই অনুধ্যান। তাঁর মনে মনে অনুরণিত হয় ভাবনা;—

"হে দীনশরণ, করুণাসিন্ধু, তুমি আমার হৃদয়স্থিত কমলকে বিকশিত কর। ওগো পরমপ্রিয়! আমায় দেখা দাও—দেখা দাও। আমার ধ্যানে তুমি যে ক্ষণিক জাগো আবার যাও মিলিয়ে। তুমি চিরাসীন হও এ দীন অন্তরে। ওগো, কর আমায় দীনের দিন, তৃণের তৃণ। না হ'লে হে দীন বন্ধু! কিরূপে বুঝব তোমার স্বরূপ?"

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের এ নিরন্তর প্রার্থনা;

"ঈশ্বর 'দীনবন্ধু'—দীন না হইলে তাঁহার এই নামের মিষ্টতা আস্বাদ করা যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে, যাহা এখনও পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। তাঁহার অনেক স্বরূপ, অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে, যাহা আমরা পরকালে অনন্তকাল জানিব। পাপী দুঃখীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ করুণা দেখিয়া পৃথিবীর সমুদায় দুঃখীরা আর্দ্র হইয়া বলিল, "তুমি দীনবন্ধু"।[১]

নিজের ভাবনার মধ্যে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কথা ভাবছেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য প্রাণ মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওই অবিশ্বাস্যরূপে পবিত্র মানুষটির সান্নিধ্য তাঁর অন্তরে যে অপূর্ব প্রেমানন্দ আনে, তাঁকে অনেক সত্য চেনায়। রামকৃষ্ণ নিশ্চিত সাধারণ মানুষ নন—ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, এ কথাই ভাবছেন কেশব। ঠিক যেন নবভাবের আর একজন শ্রীচৈতন্য তিনি।

১ 'সাধন ও তপোবন'—কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা, ২৩. ৯. ১৮৭৪

কেশবচন্দ্রের ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গান রামকৃষ্ণের ছবি, সমাধি-মগ্ন হয়ে ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটির প্রতি একবার প্রেমপূর্ণ নয়নে চাইলেন কেশব। রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়ি এসে যে আসনে বসেন সেটি ওই সম্মুখে পাট করা, তোলা রয়েছে। এ বাড়ির কিছু কিছু জিনিস তাঁর স্পর্শধন্য। একদিন কেশবচন্দ্রের কি যেন মনে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ এসেছিলেন কমল কুটিরে। হঠাৎ কেশব তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে। বাড়ির প্রতিটি ঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, তারপর নিজ ধ্যান-কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন, এটা সেটা স্পর্শ করালেন।

"এখানে বসুন, এটা ধরুন, ওটাতে পা ছোঁয়ান"।

"ব্যাপার কি গো ?" রামকৃষ্ণের চোখে জিজ্ঞাসা।

"আপনার স্পর্শে পবিত্র করে রাখতে চাই আমার বাড়ি। ঘরের আবহাওয়া—নিজের সব কিছু।"

কথা শুনে রামকৃষ্ণ হেসেছিলেন। শুধু তাই নয়। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেশব, তারপর রামকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন—পূজার অর্ঘ্য।

"তোমার মধ্যে আমি আমার প্রেমের ঠাকুরকেই দেখলাম, তাই অন্তরের পূজা নিবেদন করছি।" ভক্তের অন্তঃকরণই তো ভগবানের বৈঠকখানা।......এই চিন্তায় কেশবচন্দ্র যখন মগ্ন বাড়ির কে একজন এসে জানাল যে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র এসেছেন। এ'রা উভয়েই ঈশ্বর প্রেমিক ও সৎগৃহস্থ। কেশবের সুলভ সমাচার, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি কাগজে রামকৃষ্ণের বিষয় জেনে কৌতূহলী হয়ে রামকৃষ্ণকে দেখতে যান এবং তাঁকে ভালবেসে ফেলেন।

খবর পেয়ে গায়ে জামা দিয়ে কেশব নীচে নেমে এলেন। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালেন আগন্তুকদের।

"নমস্কার। আপনারা আসাতে খুব আনন্দিত হ'লাম।"

রাম দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কেশবচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আসনে উপবেশন করলেন। অন্দর মহল থেকে মিষ্টি আর জল এল; কেশবচন্দ্র অনুরোধ করলেন, "একটু মিষ্টি মুখে দিন আপনারা।"

তারপর ওঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ও সমাজের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় রত হলেন। রামকৃষ্ণের মুখনিসৃত বাণীর সরলতা ও উপযোগিতার কথা বললেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উৎসাহী রাম দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আপনার কি রকম মনে হয় আমাদের বলুন ?"

কেশবচন্দ্রের সুস্মিত মুখ। হাত দুটি জোড় করে বসে আছেন,—সম্মুখে দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় সামান্য মানুষ নন। এখন পৃথিবীর মধ্যে এতবর লোক আর কেউ নেই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ যে এ'কে অতি সাবধানে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না, যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাস কেসে রাখতে হয়।"[১]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম ভাগ), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৩।

"আপনাকে পরমহংস মহাশয় খুব ভালবাসেন আর মানেনও, বলেন কেশবের কত শক্তি, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত তাকে মানে। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এমনটি হয় না।"

কেশবচন্দ্র মনোমোহনের কথায় বিনীত উত্তর দিলেন, "সেটা তাঁরই মহত্ত্ব, আমি নিতান্তই সামান্য।"

মনোমোহন আবার বলেন, "আমরা তো দেখি আপনাকে কাছে পেলে পরমহংস মহাশয় আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন আর কাউকেই চান না। বলেন, কেশব আমার মনের মানুষ, সে আমায় যেমন চায়, তার দলের কেউ তেমন চায় না।"

এবার রামদত্ত বললেন, "পরমহংস মহাশয় আরও বলেন, 'কেশবের যোগ ভোগ ; সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।"[১]

কেশবচন্দ্র কথাগুলি শুনে হাসি মুখে নীরবে থাকলেন। কিছু পরে আত্মগত ভাবে বললেন, "এমন পবিত্র বন্ধু জগতে আর নেই।"

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর রামদত্তরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ( ৪র্থ )।

একবার রামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কেশবের সত্যে খুব আঁট। সে বাপের ধার মেনেছিল। অন্যলোক হ'লে কখনও মানত না। একে লেখা পড়া নেই।" [ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ( ৩য় ভাগ )

## ১৪

বছর ঘুরে ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসব এসে গেল। তারই আয়োজনে কেশব, প্রতাপ, ত্রৈলোক্য, জয় গোপাল প্রভৃতি সকলে ব্যস্ত। তবু উৎসবের আগে একদিন সঙ্গে সবাইকে নিয়ে কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে এলেন।[১] তবে কাজে ব্যস্ত থাকায় সকলের সঙ্গে তিনি আসতে পারলেন না। অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তরা কেশবচন্দ্রের আসবার অনেক আগেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন এবং রামকৃষ্ণের কাছে বসে আছেন। এদের সঙ্গে রয়েছেন রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকেই।

কেশবচন্দ্র এখনও এসে পৌঁছান নি। স্টীমলঞ্চে করে আসার কথা তাঁর। সকলেই সকলেই ব্যস্ত হয়ে দক্ষিণে চাইছেন কখন কেশবচন্দ্র এসে পৌঁছান এই আশায়। রামকৃষ্ণও বেশ ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

অবশেষে কেশবচন্দ্র এসে পৌঁছুলেন। তাঁর হাতে দু'টি পাকা বেল ও ফুলের তোড়া। তাঁকে দেখে রামকৃষ্ণ হাসলেন, মুখে একটি অভিমানের ছোঁয়াও রয়েছে। ভাবখানা,—এই তোমার আসার সময় হ'ল, তোমার জন্য কতক্ষণ বসে আছি।

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের চরণে পুষ্পস্তবক ও তাঁর পাশে ফলদুটি রাখলেন ও তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন। রামকৃষ্ণও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রতি-প্রণাম জানালেন।

কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করে তাঁকে দিয়ে অন্যকে প্রণাম করিয়েছেন রামকৃষ্ণ। তাঁর রাজসিকতার দীপ্তির প্রখরতাকে মাধুর্য মণ্ডিত করেছেন, আপনি নত হয়ে তাঁকেও প্রণত করেছেন।

মানুষকে বা মূর্তিকে প্রণাম করা চলবে না—ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম ও সংস্কার বিপ্লবের পথে এই অহংবোধ এসেছিল। কেশবচন্দ্রও তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ঈশ্বরের সন্তান মানুষের অন্তরে তো তাঁরই অধিষ্ঠান ; প্রণাম যখন করা হয় তখন অন্তরস্থিত সেই প্রণম্যকে করা হয়।

রামকৃষ্ণ নত হলেন। ভাবখানা আমি নত হয়ে তোমাকে বিনত করব। তুমি একটু নত হলে আমি আরও নুয়ে পড়ব, ধূলায় মিশিয়ে যাব। তোমার রাজসিকতার রক্তপদ্ম আমি গোলাপী করব, সুরভিত করব। তুমি যে আমার আপন জন। আমি যে ভালবাসি তোমায়। জনে জনে, আধারে আধারে ঐ রং ধরাবার কাজ নিয়েই এসেছি।

কেশবচন্দ্র যত সোজা থাকেন, রামকৃষ্ণ ততই নুয়ে পড়েন। আর কি পারেন কেশব খাড়া হয়ে থাকতে যেখানে তাঁর মরমের মানুষটি নত। তিনিও অনুভব করলেন, প্রণাম করা সেই প্রণম্যকেই যিনি জনম-জীবন-মরণ-পরিচালক, তাঁরই কাছে নত হওয়া।

দু'জনে পাশাপাশি বসেছেন। রামকৃষ্ণের অধরে মধুর হাসি, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেছেন। মৃদু হেসে বললেন, "তুমি তো আমায় চাও কিন্তু তোমার চেলারা

১ দিনটি ছিল শনিবার, ১লা জানুয়ারী, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচ্‌মচ্‌ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।"

ব্রাহ্মভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, "ঐ গো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ খচ্‌মচ্‌ করছিলুম, জমবে কেন।"

কথা শুনে চারিদিকে হাসির ঢেউ উঠল। রসিক রামকৃষ্ণ তারপর বললেন, 'গোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযাত্রায় দেখনি, নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন বলেন, 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন', তখন রাখাল সঙ্গে কৃষ্ণ আসেন। পশ্চাতে সখীরা, গোপীরা"।[১] একটু থেমে আবার বললেন "ব্যাকুল না হ'লে ভগবানের দেখা পাবেনা।"

সবাই নীরবে একাগ্র মনে অমৃত কণ্ঠের অমৃতবাণী শুনছে। ঈশ্বরের কথা বলতে আরম্ভ করলে ভাবের এত উদ্দীপন হয় যে রামকৃষ্ণ কিছুতেই থামতে পারেন না। ভাবের তরঙ্গ একটার পর একটা আসতেই থাকে।

কথার মাঝে হঠাৎ কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "তুমি কিছু বল কেশব, এরা তোমার কথা শুনতে চায়।"

"আপনার সামনে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা আর কি বলব। এখানে ও বিষয়ে কথা কওয়া আর কামারের কাছে ছুচ বিক্রী করতে আসা একই কথা।" হাসি মুখে নম্র কণ্ঠে কথা কটি বললেন, ব্রহ্মানন্দ কেশব।

কত নিরহঙ্কার নিরভিমানী মানুষ। জ্ঞান, বুদ্ধি, ভক্তি ও উপলব্ধিতে মহৎ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ হয়েও আপনাকে তিনি কখনও প্রকাশ করতে চান না। স্বরচিত 'জীবন বেদে, 'অনৃত খণ্ডন' করেছেন কেশব —"আমার জীবন বেদ পাঠ না করিয়া কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা মিথ্যা কথন অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। যে সকল মিথ্যা কথা স্পষ্ট রূপে নির্ধারণ করা আবশ্যক, তাহাই জীবনের বিশেষত্ব না জানিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন ও তদ্বারা যে সমস্ত অনৃত বচনে দোষী হইলেন, সে সকল খণ্ডন করা আবশ্যক। মিথ্যা কথন দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী?

পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্তক মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের কীটকে যাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহে। আমি তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত? একথা নিতান্ত অসার। যাঁহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাঁহাদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইব? যাঁহাদের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী যাঁহাদিগকে ভক্তি করে, যাঁহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাণের সাহায্য লাভ করিয়াছে সেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণ প্রার্থী হইয়া যাইব, জীবের সহায় হইয়া একত্রে বসিতে চেষ্টা করিব না, এক আসনে বসিব না।

*　　*　　*　　*

নীচে বসিয়াছেন যাঁহারা, দৃষ্টান্ত লইতেছেন যাঁহারা সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম ভাগ) ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৭১-৭২।

আমি। ইহাতেই আমার গৌরব। আমি তাহাদিগের নাম করিয়া পবিত্র হই, নৃত্য করিতে পারি এই আমার সুখ শান্তি।

* * * *

দাঁড় লইয়া একজন চালান, একজন চালিত হয়, একজন ভাবেন তাই একজনকে ভাবিতে হয় না। আমার জীবনের এই গূঢ় কথা যদি জানিতে চাও, তবে জীবন বেদ পড়। এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বারবার ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিত্ব পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী ; ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়।......ঈশ্বর পবিত্রাত্মা মানুষের জীবনতরীকে চালান, ইহাতে কোন সংশয় নাই।......একজন মূর্খ নীচ অবস্থার লোক হইতে পারে অথচ ঈশ্বর দয়াময়ী মাতা হইয়া তাহাকে সত্যের পথে, সাংসারিক শ্রী সম্পদের পথে চালান।......যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী। আমি ধনী, মানী ও জ্ঞানী এ জ্ঞান আমার নাই। যদি কেহ আমাকে ধনীদিগের মধ্যে স্থান দিয়া থাকেন তবে ভ্রান্তি বশতঃ দিয়াছেন।......যাঁহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে এমন উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন।......যাঁহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারাও মিথ্যায় পতিত হ'ন।

দরিদ্র কে? যে কাঁদে, সেই দরিদ্র, সেই দুঃখী। দীনবন্ধু আমাকে সে দলে ফেলেন নাই। ধন না থাকিলে যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণ্য করিতে পার তবে সে ব্যক্তি আমি। পৃথিবীর ধনকে আমি তুচ্ছ বোধ করি। কল্যকার জন্য উদাসীন হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে স্থির রাখি, আমার তিনিই ধন। আমি কেন ভাবিব? যিনি ভাবিবার তিনি ভাবিবেন। ধন আমার ভাণ্ডারে আছে, বাড়িতে নাই। পিতার কাছে সকলই আছে, তাহার দেওয়া আর আমার লওয়া কেবল বাকি।............

এখানকার সামান্য একজন বিদ্বান যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তাহা জানি না। যে জ্ঞান আছে তাহা বলিতে পারি এমন ভাষা বোধ আমার নাই। বিদ্য আমার নাই, জ্ঞান যাহাকে বলে, সে জ্ঞান আমার নাই। যাহা থাকিলে বিদ্বান বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায় তাহা আমার নাই। কিন্তু জ্ঞানে আমার ঔদাসীন্য নাই। আমি যে ঈশ্বরের কথা জানি না, কি উপদেশ দিতে পারি না, তাহা নহে। একজন জ্ঞানী আমার বাড়িতে থাকেন, আমর দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীর শাস্ত্র শুনিয়া আমি বিদ্যা সম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি। লজ্জা নিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ব্যবস্থা করেন। আর কে মানী? উচ্চ পদস্থ লোক অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত আলাপ করেন। আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে তাহা হরির জন্য। আমার মান হরির মান। পৃথিবীর মান পাই নাই. পাইব না, সুতরাং হারাইবারও আশঙ্কা নাই। পৃথিবীর কাছে কোন প্রকার মান প্রাপ্ত হই নাই।

ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান। ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি।... নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই। হরিচরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরিচরণ ব্যতীত আর কোথাও জ্ঞান, শান্তি পাওয়া যায় না। হরিচরণই সর্বস্ব।

* * * *

হে দীনবন্ধু, হে আশ্রয় দাতা, এ জীবনের পঁচিশ বৎসর তোমারই স্বাক্ষী। এ জীবন তোমাকেই জগতের কাছে প্রকাশ করুক, আমি কৃতার্থ হই।

তুমি কি করিলে? সমুদায় করিলে।......আমার জীবন যে সোনার জীবন হইল। পরমেশ্বর আমার জীবনকে সোনার করিয়াছে। হৃদয়কেও হীরকখণ্ড করিয়াছে। এমন হীনকে এতবড় করিলে!

* * * *

এই জীবনবেদ পৃথিবীর লোক পাঠ করুক, আলোচনা করুক, এ জন্য নয় যে, আমাকে সুখ্যাতি করিবে।

লোকে বলে, হরি আগে যেমন ভক্তকে লইয়া অলৌকিক ক্রিয়া করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না, এখন ঈশ্বর দূরে গিয়াছেন।

হে হরি! আমার প্রাণের সহিত এ অনৃত খণ্ডন করিয়া যাই।......আমার জীবনতরী কোথায় পড়িয়াছিল, আর আজ এ কোন ঘাটে লাগিল। এ যে বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি। এখন তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই বলিব, যাহা করাইবে তাহাই করিব। হরি, আমি তোমারই।......"

—এ জীবন-চিত্র রামকৃষ্ণ প্রিয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের। কেশব আপন মনে নানা কথা ভাবছিলেন। রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন—"তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব আর গাঁজাখোরের স্বভাব একই। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমি একবার টানলুম এই আর কি। কলকে হাতে হাতে না ফিরলে নেশা জমে না, ভক্তে ভক্তে ঈশ্বর কথা চললে আরও জমে।"—অপরূপ সুন্দর বাক্য-মালা রামকৃষ্ণের।

এখন অপরাহ্ন। চারটে বাজে। সূর্য কোমল হয়ে গেছে, স্নিগ্ধ হওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। কালীবাড়ীর নহবতের বাজনা শোনা যাচ্ছে। সকলে বাজনায় মনোনিবেশ করেছেন। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে বললেন, "দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। তবে একজন কেবল পোঁ করছে আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগরাগিনীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে কেন শুধু পোঁ করব; কেন শুধু সোহং সোহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিনী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব। শান্ত, দাস্য বাৎসল্য, সখ্য মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকব, আনন্দ করব, বিলাস করব।"[১]

উপমার অলঙ্কারে সাজান কথাগুলি বড় মধুর লাগে শুনতে। এমন উপমার সৌন্দর্য কোথাও নেই। কেশবচন্দ্র অবাক হয়ে কথাগুলি শুনে অন্যান্যদের মৃদু কণ্ঠে বললেন, "জ্ঞান ও ভক্তির এমন আশ্চর্য সুন্দর ব্যাখ্যা কোথাও পড়িনি, কখনও শুনিনি। এ অপূর্ব!" তারপর রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন,—

"আপনি কত দিন এমন লুকিয়ে থাকবেন? ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।"[২]

---

১, ২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম ভাগ), পরিশিষ্ট, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭২।

"ও তোমার কি কথা !"—রামকৃষ্ণের কণ্ঠ হ'তে মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—

"আমি খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড় করা করি আমি জানি না। কে জানে তোর গাঁই গুঁই বীরভূমের বামুন মুই। হনুমান বলেছিলেন, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ও সব জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।"[১]

আমি ভগবানকে ভালবাসি, কারণ তাঁকেই আমার ভালবাসতে হবে। তাঁকে ডাকি কারণ তাঁকেই আমার ডাকতে হবে। এই জগত-জীব তাঁর সঙ্গে ওতঃপ্রোত। তাঁকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। লোক আসবে কি আসবে না, আমার কথা কে শুনবে কি শুনবে না, আমি তা জানি না। সকলি তোমার ইচ্ছা। তুমি ইচ্ছাময়ী মা।

হাঁ সবই সেই ইচ্ছাময়ী জগজ্জননীর ইচ্ছা। তাই কেশব-রামকৃষ্ণের মিলন, কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের অঙ্কুরোদগম। তাঁকে দিয়েই ভবতারিণী মা রামকৃষ্ণকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করালেন।

সে তুমি যা বল, বীরভূমের বামুনই হও আর যেই হও। তোমায় আমি চিনেছি। তুমি সেই করুণাঘন রূপ। বুঝেছি গ্লানিময় জগতে কেন তুমি আবির্ভূত হয়েছ ;—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"—

তাই কেশব বললেন, "আমি আরও লোক জড়ো করব। আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।"

নব বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণে নতুন ফুল ফুটেছে। আমি তার সৌরভে ম্লানিমা মুক্ত হতে সকলকে আহ্বান করব।

কথা শুনে রামকৃষ্ণ বললেন, "আমি সকলের রেণুর রেণু। যিনি দয়া করে আসবেন,—আসবেন।"

আমি দাসানুদাস, মানুষের অন্তরে যে ঈশ্বর বিরাজিত তাঁর সেবক।

ব্রহ্মানন্দ এবার ভালবাসার জোর দিয়ে বললেন,

"সে আপনি যা হয় বলুন। আমি ওসব শুনব না। আমি জানি আপনার আসা বিফল হবে না।"[১]

এখানে এই সকল তীর্থের মুখ্য তীর্থে লোকে দয়া করে নয়, কৌতূহলী হয়ে নয়, নিজের গরজেই আসাবে—আসবে কলুষ মুক্ত হতে। এই শান্তির পারাবারে আসবে সংসার তাপ হইতে বিশ্রাম নিতে।

উভয়ের মধ্যে যখন এই কথাবার্তা চলছে তখন অন্যদিকে সংকীর্তনের আওয়াজ হচ্ছে। অনেক ভক্ত কীর্তন গানে যোগ দিয়েছেন। পঞ্চবটি থেকে দলটি রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসছে। হৃদয় শিঙা বাজাচ্ছেন ঘন ঘন।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), পরিশিষ্ট, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭২

কীর্তন শুনে রামকৃষ্ণ ভাব-বিহ্বল হয়ে গান ধরলেন—

"হরি নাম নিসরে জীব যদি সুখে থাকবি।
সুখে থাকবি, বৈকুণ্ঠে যাবি
ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি।
( হরিনাম গুণেরে )
যে নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে
আজ সেই হরিনাম দিব তোকে।"

উদাত্ত কণ্ঠে রামকৃষ্ণ গান গাইছেন আর সেই সঙ্গে সিংহ-বিক্রমে নৃত্য করে চলেছেন। ক্ষণপরেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হলেন।

নিবাত নিষ্কম্প রামকৃষ্ণকে সকলে নির্নিমেষ লোচনে দেখছেন। ধীরে ধীরে সমাধি ভাঙ্গল। কেশবচন্দ্র ও অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে ধরে ধীর পায়ে ঘরে নিয়ে এলেন। তাঁর চরণদ্বয় মাটিতে ঠিক স্পর্শ করছে না—তিনি টলছেন। অন্তরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে প্রবল ঈশ্বরীয় ভাব। রামকৃষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে চলেছেন। কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন "সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, যেমন, তোমরা কেউ গাড়ী, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজ করে বা কেউ পদব্রজে এসেছ, যার যাতে সুবিধা আর যার যা প্রকৃতি সেই অনুসারে এসেছে। উদ্দেশ্য এক, কেউ আগে এসেছ, কেউ পরে এসেছ।"

এরপর তিনি কেশবচন্দ্রকে অহংকার ত্যাগই যে ঈশ্বর দর্শনের উপায় সে কথা বললেন।

"উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তেমনি তাঁর কৃপাবারি যেখানে অহংকার সেখানে জমে না।" [১]

তাই দীন হও—তিনি যে দীনশরণ, দীনবন্ধু।

"তাঁর কাছে দীন হীন ভাবই ভাল।" গলাটা একটু নামিয়ে চুপি চুপি বলার মত ভঙ্গীতে বললেন, "খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড় চোপড়েও অহংকার হয়। পিলে রোগী দেখেছি কালা পেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে।" কথা শুনে সকলে আনন্দে হেসে উঠল।

দীন ভাবের ভাবুক হও, দীন হওয়ার তপস্যা কর। দীন হওয়া মানে দেমাক শূন্য হওয়া, অহংকার রহিত হওয়া, অন্তরে দরিদ্র হওয়া নয়। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এই দীনভাবের তপস্যা সহজ নয়; পীলে রোগীও কালা পেড়ে কাপড় পরলে নিধুবাবুর টপ্পা গায়।

এই যেমন, "কেউ বুট পরেছে অমনি মুখে ইংরাজী কথা বেরুচ্ছে" রামকৃষ্ণ বললেন, "সামান্য আধার হলে গেরুয়া পড়লে অহংকার হয় একটু ত্রুটি হ'লে ক্রোধ, অভিমান হয়।"[২]

কথার মাঝে কেশবচন্দ্র তাঁকে পরলোকের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। রামকৃষ্ণ দ্রুত তৎক্ষণাৎ ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম) ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট—পৃঃ ৭৩

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম) ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট—পৃঃ ৭৪

বাপু ?" তারপর ক্ষণিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। পরে ধীর গলায় বললেন, "যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাড়ি, সরা, রোদে শুকুতে দেয়, ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয়ে তাহলে তৈরী লাল হাড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।"

যে লাল হয়ে পেকেছে অর্থাৎ যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে সে জন্মরহিত, সে মুক্ত। যে কাঁচা আছে সেই আবার সংসারে যাতায়াত করবে। এ কথার পর রামকৃষ্ণ বললেন ;

"আগে ভোগান্ত, তারপর ব্যকুলতা, তারপর ঈশ্বর দর্শন—ঈশ্বর লাভ।"

"ব্যাকুল না হ'লে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যকুলতা ভোগান্ত না হ'লে হয় না। যারা কামিনী আর কাঞ্চনের মধ্যে রয়েছে তাদের ভোগান্তি হয় নি, তাঁদের ব্যাকুলতা আসে না।" একটি সহজ সুন্দর উপমায় কথাটি বোঝাচ্ছেন রামকৃষ্ণ, "ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত, আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, এক রকম ভুলে থাকত। যেই সন্ধ্যা হয় হয় অমনি বলে 'মা যাব।' আমি কত ভোলাতুম, বলতুম পায়রা দেব, এই সব কথা। কিন্তু ছেলে ভুলত না। তখন তার কান্না আর সঙ্গে কেবল 'মা যাব', 'মা যাব' বলা। খেলা টেলা কিছুই আর মন টানছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম।"[১]

শিশু যেমন তাঁর মার জন্য কাঁদে তেমনি ঈশ্বরের জন্য কান্না। এরই নাম ব্যাকুলতা। তখন সংসার-খেলা, আহার নিদ্রা কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে ঈদৃশ ব্যাকুলতা জাগে হৃদয়ে ও প্রাণে। গুমরে ওঠে কান্না—জগৎ-বিধাত্রীর জন্য কান্না। মা যাব—মা যাব।

ঈশ্বর-ভাব-কথার অফুরন্ত উৎস রামকৃষ্ণ : উদ্দীপন হলেই হ'ল, তাঁর শ্রীমুখ হ'তে অনর্গল অমৃতবাণী উত্থিত হয়ে তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণ করবে। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছেন।

সন্ধ্যা সমাগত। একজন ঘরে বাতি-জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তরা জলযোগ করে তবে যাবেন, রামকৃষ্ণ এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ঠাট্টা করে কেশব বললেন, "আজও কি মুড়ি ? আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে।"

রামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "হৃদুকে বল, সে ম্যানেজার।"— উভয়ে হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দালানে পাতা পড়ল। সবাই পংক্তিতে খেতে বসলেন। প্রথমে মুড়ি, তারপর লুচি তরাপর তরকারী—সবাই আনন্দে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। আহার পর্বে রাত দশটা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারপর সকলে পঞ্চবটি মূলে বিশ্রামের জন্য বসলেন। রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র পাশাপাশি বসে আলাপরত। কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা কেউ বিষয় আশয় ঠিকঠাক করে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে কি ? তাঁর তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি।"

হাসতে হাসতে রামকৃষ্ণ বললেন, "তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার যে পাতকুয়ো,

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), পৃঃ ৭৪

আত্মীয় যে কালসাপের মত বোধ হয়। তখন টাকা জমাব, বিষয় ঠিকঠাক করব এসব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয় চিন্তা।" "যেমন একটা মেয়ের ভারি শোক হয়েছিলো," উপমা সহ বোঝাচ্ছেন,—"আগে নথটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে, তারপর 'ওগো আমার কি হ'ল গো' বলে আছড়ে পড়ল, কিন্তু খুব সাবধানে নথটা যেন ভেঙ্গে না যায়।" বলার ভঙ্গিমায় সবাই হেসে ওঠে।

কেশবচন্দ্র ভাবেন কত সহজ ভাবে কি গম্ভীর অর্থব্যঞ্জক কথাই না বললেন রামকৃষ্ণ। এই যে তিনি বৈরাগ্যের কথা বললেন, আশ্চর্য! সেই আঠারো বৎসর বয়স থেকেই তো তিনি বৈরাগ্যের জ্বালা অনুভব করে চলেছেন। এর থেকে আজও মুক্তিলাভ হয় নি। ঈশ্বর দর্শনের কাছে বিষয় চিন্তা সত্যই কত ছার!

কেশবচন্দ্রের দিকে পদ্ম-পলাশ চোখে স্থির দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন, "ঈশ্বর লাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। বুড়ি ছুঁয়ে তারপর খেলা কর না।"[১]

এ খেলা একেবারে উল্টো খেলা, এ ভবের খেলা নয়—এ ভাবের খেলা। খেলতে খেলতে বুড়ী ছোঁওয়া নয়, বুড়ী ছুঁয়ে তবে খেলা।

"ঈশ্বর লাভের পর ভক্ত নির্লিপ্ত হয়। যেমন পাকাল মাছ। পাঁকের ভেতর থাকে অথচ গায়ে পাঁক লাগে না।"

রামকৃষ্ণ বলে চলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর বাকভঙ্গিমা। কেশব ভাবে প্রায় বেহুঁশ হয়েছেন। কখনও উজ্জ্বল আয়ত নয়নে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে রামকৃষ্ণকে দেখছেন। তাঁর চোখ দু'টি থেকে প্রেমের আলো আর আনন্দ ঝরে পড়ছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। রাত অনেক হ'ল। সকলে এখন যাবার জন্য ব্যস্ত। প্রতাপ মজুমদার বললেন, "অনেক রাত হ'ল, আজ এখানে থেকে গেলে হয়।"

রামকৃষ্ণ কেশবকে বললেন, "আজ এখানে থাক না।"

"একটু কাজ আছে, যেতে হবে" কেশবের সহাস্য উত্তর। শুধু কি কাজ? যত কাছাকাছি তত ভাল লাগালাগি, কিন্তু দূরে থাকলে যে বিরহের সুমধুর আনন্দ—ভালবাসাবাসি।

কথা শুনে হাসতে হাসতে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে বললেন, "কেন গা, আঁস চুবড়ির গন্ধ না হলে বুঝি ঘুম হবে না?"

তারপর বললেন, "মেছুনি মালীর বাড়ি রাতে অতিথি হয়েছিল। তাঁকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না।"—কথা শুনে সবাই মজা পেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন, রামকৃষ্ণ বলে চলেছেন, "মছুনী তো বিছানায় শুয়ে উস্‌খুস্ করছে। সে ঘুমিয়েছে কি না তা দেখতে এসে মালিনী দেখে তার সঙ্গীন অবস্থা। বলল, 'কিলো, ঘুমুচ্ছিস নি কেন?' মেছুনী কাতর হয়ে বলল, 'সই একবার আমার আঁস চুবড়িটা আনিয়ে দে।" তখন মেছুনী আঁসচুবড়ি এনে তাতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ নিল আর একটু পরেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), পরিশিষ্ট ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৫

কথা শেষ হলে সকলে হেসে উঠল। রামকৃষ্ণের সাথে আনন্দের হাট।

বিদায় কালে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করা একটি পুষ্পস্তবক তুলে নিলেন ও তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। রামকৃষ্ণও সকলকে প্রতি-প্রণাম জানালেন।

তারপর বিদায়ের মুখে ব্রহ্মানন্দ কেশব হাত তুলে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "জয় বিধানের জয় হোক।"

অপর ব্রাহ্মরাও বললেন, "জয় বিধানের জয় হোক।" জয় গোপাল সেনের গাড়ী করে সে রাতে কেশবচন্দ্র কলকাতা ফিরলেন।

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন ॥
খুজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার কোন্ সে জন।
কুবীর বলে শোন, শোন, শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

—গান গেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ অনেক দিন আগে, তারই রেশ কেশবচন্দ্রের মনে। জাহাজে বসে কুলকুল নাদিনী ভাগীরথীর জলশব্দে এ গানই যেন শুনতে পাচ্ছেন তিনি, "খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।"

ভাগীরথীর বুকচিরে জলোচ্ছাস নিয়ে জাহাজ দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে চলেছে। সমাজের নানা সংস্কারের কাজে ব্যস্ত থাকলেও কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগতদের সঙ্গে নিয়ে নামযাত্রায় বেরিয়েছেন।[১] বাষ্পীয় যানটি তাঁর জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনাথ ভূপ মহাশয়ের। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আছেন তার জামাতা এবং আর একজন আত্মীয় ভক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভাগীরথীর বাতাস হরিনামে সুরভিত করে জহাজ দক্ষিণেশ্বর ঘাটে এসে ভিরল। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে জাহাজে তুলে সঙ্গে নিয়ে নদীবক্ষে বেড়াবেন মনস্থ করেছেন, সেজন্য কেউ জাহাজ থেকে নামলেন না।

সংবাদ আগেই দেওয়া ছিল। রামকৃষ্ণ ভাগনে হৃদয়ের সঙ্গে বাষ্পীয় পোতে এসে উঠলেন। তাঁর মুখে শিশুর সরল হাসি, পরণে লাল পাড় ধুতি আর গায়ে জামা। জামার বোতাম নেই। সংসারে কোন বন্ধনই নেই তাই জামা বাঁধবার জন্য বোতামও নেই তাঁর জামায়।

হৃদয়ের হাতে রয়েছে ঝুড়ি ভর্তি মুড়ি আর সন্দেশ। রামকৃষ্ণ জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। হৃদয়ের হাত থেকে ঝুড়িগুলো নিয়ে কে একজন সেগুলি একটু তফাতে রাখল। কেশবচন্দ্র হাসিমুখে রামকৃষ্ণের হাত ধরে তাঁকে নিজের খুব কাছে বসালেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁদের পদপ্রান্তে বসলেন।

জাহাজ সোমড়া অভিমুখে চলল।

রামকৃষ্ণের মুখে ছোট দাড়ি, গাত্রবর্ণ মাঝারি ধরণের গৌর কিন্তু জ্যোতির্ময়, নয়ন উজ্জ্বল। দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যালে হলেও তীক্ষ্ণ ও গভীর। তাকালে মনে হয় ভিতর পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর দৈহিক উচ্চতা মধ্যম আকারের, ছিপছিপে গড়ন। রোগা রোগা দেখাচ্ছে।

---

১ সমরত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

রামকৃষ্ণই কথা বলে চলেছেন মৃদু ও অস্ফুট উচ্চারণে, কখনও 'তুমি' বা 'আপনি' সম্বোধনে। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য সকলে আগ্রহ সহকার তাঁর কথা শুনছেন। ইতিপূর্বে এমনটি কেউ বলে নি—কেউ শোনেও নি। গৈরিক নিঃস্রাবের মত তাঁর কথা যেন মুখ থেকে ঝরে পড়ছে। উপমার অলঙ্কার সাজান তাঁর বচন সুধা সত্যই বড় মর্মস্পর্শী ও বৈশিষ্টে উজ্জ্বল।

কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসছেন, মাঝে মাঝে তাঁর ভাব-সমাধি হচ্ছে। কেশবচন্দ্র তাঁর বাহ্যজ্ঞানহীন দেহটিকে আলতো ধরে রাখছেন।

সকলে নীরব। রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, আবার সমাধি ভাঙ্গছে। সমাধি ভাঙ্গলে তিনি আয়ত চোখে চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখছেন। একবার সমাধি ভঙ্গের পর চতুর্দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন,—

"বেশ, বেশ। বেশ সব পটল-চেরা চোখ।" তারপর এক সাহেব বেশী যুবককে দেখে কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে? এ'কে সাহেব সাহেব দেখছি।"

কেশবচন্দ্র হেসে বললেন, "না, উনি একজন বাঙ্গালী। হালে বিলাত থেকে ফিরেছেন।"

"তাই বল মশাই, সাহেব দেখলে ভয় করে কিনা।"

সাহেব বেশী যুবকটি হচ্ছেন কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে সময় গেল। তারপর কেশবচন্দ্র হঠাৎ বললেন, "হৃদয়বাবুর হাতে খাবারের হাঁড়িটি দেখা পর্যন্ত আমার ক্ষুধোদ্রেক হয়েছে।" তিনি এমন ভাবে কথা বললেন যে সকলে হেসে উঠল।

হৃদয় ও অন্য একটি ভক্ত সকলকে মুড়ি ও সন্দেশ বিতরণ করলেন। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। কুচবিহার মহারাজা ও অন্য আরও কয়েক ব্যক্তি শুধু একটু সন্দেশ ভেঙ্গে মুখে দিলেন।

রামকৃষ্ণ খেতে খেতে বললেন, "কেশব, মায়ের কৃপায় তোমার তো যদৃচ্ছা লাভ।"—কথা শুনে ব্রহ্মানন্দ মৃদু হাসলেন।

পরমুহূর্তে উপস্থিত মানুষদের যেন ভুলে গেলেন রামকৃষ্ণ। আপন মনে তাঁর নিজের সাধনার কথা বলতে আরম্ভ করলেন; তিনি বললেন,

"তখন কখনও আমি কল্পনা করতুম আমি যেন 'চকী'। আমি ডাকতুম 'চকা' আর অমনি আমার ভেতর থেকে ডাক আসত 'চকী'।"

তিনি বিহঙ্গ চকা-চকীর কথা বলছেন।

আবার বললেন, "কখনও আবার আমি বলতুম 'মিঁউ' আর যেন কোন ধাড়ি বেড়াল বলত 'ম্যাও'। রামকৃষ্ণের আপন মনের এ সকল কথা বুঝতে না পেরে সকলে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। এই ভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন ও বাচ্চা ছেলের মত হেসে বললেন, "জেনো মশাই, গোপন সাধনার সব কথা বলতে নেই।"[১]

১ Modern Review—Vol I 1927, PP 537-539

তারপর তিনি বোঝালেন যে উচ্চভাবানুভূতির কথা, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের কথা, বর্ণনা করে বলা যায় না। কথা বলে তিনি দু'একজনের মুখপানে দৃষ্টিপাত করলেন।

প্রত্যেক মানুষের মুখ-গঠন আলদা আর প্রত্যেকের মুখাকৃতিতে মানবের কিছু না কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা আছে। মুখ দেখেই তার প্রকৃতি কেমন অনুমান করা যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চোখ তবে কপাল, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও দন্ত এদেরও লক্ষণ আছে, এ'দের বিচার করেও চরিত্র বিচার করা যায়। আপন মনেই রামকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন। যেন নিজেকে নিজে বলা।

তারপর তিনি নিরাকার ব্রহ্মের সম্বন্ধে বললেন, —

"নানা পথ দিয়ে নানা ধর্মের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর লাভ হতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন ভজন করে ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকা যায়। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে তিনি দেখা দেন।

"তোমাদের নিরাকার ভাবনাও খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে ঠিক বোধ করবে। ঈশ্বর সত্য আর সবই অনিত্য। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার ও নিরাকার দুইই মানে। নানা ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। রোশন চৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশির সাত ফোকর আছে কিন্তু আর একজন তারও বাঁশিতে সাত ফোকর আছে. সে নানা রাগ রাগিনী বাজায়।

"তোমরা সাকার মান না তাতে কিছু ক্ষতি নেই, নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হ'ল। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নিও। মা বলে ডকলে ভক্তি প্রেম আরও বাড়ে। কখনও দাস্য কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব। কোনো কামনা নেই, হেতু নেই। তাঁকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। টাকাকড়ি মান সম্ভ্রম, কিছুই চাই না। কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ বল, পুরাণ বল, তন্ত্র বল সবেতেই এক ঈশ্বরের কথা আছে।"

রামকৃষ্ণ অনর্গল কথা বলে চলেছেন। হঠাৎ তিনি দু'বার 'নিরাকার' 'নিরাকার' উচ্চারণ করেই গভীর সমাধি মগ্ন হ'লেন। কেশবচন্দ্র বেশ কিছু সময় গভীর অনুরাগের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, তারপর অন্যান্যদের বললেন, যে সম্প্রতি পরমহংস দেবের সঙ্গে 'নিরাকার ব্রহ্ম' সম্পর্কে তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং অনেক প্রশ্ন সমাধান হয়েছে।[১]

রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কেশবচন্দ্র নিরাকার-সাকারের দ্বন্দ্ব দ্বিধার মধ্যে পড়েন নি। নিরাকার ব্রহ্মের সেবক ব্রহ্মানন্দ কেশব রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেই সাকার-নিরাকারের রহস্য পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করলেন। অন্য দিকে রামকৃষ্ণও নিরাকার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিছুদিন পূর্বে আচার্য উপদেশে ( রবিবার, ৪ঠা জুলাই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ ) 'এক কি তেত্রিশ কোটি' বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র তাঁর সাকার উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন ;—

"ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী হইতে হিন্দুস্থানের প্রাচীন বিবাদ অদ্য মীমাংসা করিতে

১ Modern Review Vol I 1927

হইবে। এই দেশে বহুকাল হইতে একটি প্রকাণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সেই সংগ্রামের একদিকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম, অপরদিকে পৌত্তলিকতা, একদিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, অন্য দিকে বহু দেব দেবী। এই দুইএর মধ্যে যদি সন্ধি স্থাপিত না হ'য় তবে অকল্যাণ ও অনিষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। যতদিন এই সংগ্রাম চলিবে, ততদিন রাজ্যের কল্যাণ নাই, সামাজিক কুশল নাই। ঈশ্বর এক কি তেত্রিশ কোটি? হিন্দুধর্মরূপ বৃক্ষের মূলদেশে যদি নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে দেখি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বসিয়া আছেন। কিন্তু বৃক্ষের শাখা গণনা করিয়া দেখি, সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা। বাস্তবিক হিন্দুধর্মের মূলেতে যদিও একেশ্বরবাদ নিহিত, ইহার পৌত্তলিক শাখা-প্রশাখা অসংখ্য।

একদিকে একমেবাদ্বিতীয়ম আর একদিকে দুই নহে, পাঁচ নহে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবদেবী। কিরূপে এদেশে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি অসম্ভব?

* * * *

আর্য সমাজের আদিতে এক ঈশ্বর পূজা প্রবর্তিত ছিল। কালক্রমে যখন পুরাণাদি রচিত হইল, তখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অথবা অসংখ্য দেবদেবীর অর্চনা আরম্ভ হইল। আদিতে ব্রহ্মপূজা অন্তে মূর্তিপূজা।

* * * *

ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী অনেকে তেত্রিশ কোটি শব্দ শুনিবামাত্র রাগে প্রজ্জ্বলিত হ'ন এবং উহা সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া উহার মূলতত্ত্ব পর্যন্ত বিনাশ ও পরিহার করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মপূজা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। হিন্দুদিগের এই যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ইহা অসার খোলার ন্যায় কেবল বাহ্যিক আচ্ছাদন মাত্র, উহার ভিতরে ব্রহ্ম স্বরূপের খণ্ড খণ্ড যে সকল ভাবরূপ শস্য নিহিত রহিয়াছে, সে সমস্ত সুকৌশলে বাহির করিয়া লইতে হইবে।

* * * *

ঐ তেত্রিশ কোটির প্রত্যেকের ভিতর এক একটি সত্য আছে, যাহা প্রতি ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়। দেবদেবীর মূর্তি পূজা আমাদের পক্ষে অসত্য ও পাপ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য। কিন্তু মূর্তি পরিহার করিতে গিয়া উহাতে যে ভাব মূর্তিমান ছিল তাহা যেন আমরা ছাড়ি না।

হিন্দুস্থানে যে অসংখ্য অগণ্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত তৎ সমুদায় ব্রহ্মস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও বিভক্ত প্রতিভামাত্র। দেবদেবীর ভিতর হইতে যদি আমরা নিগূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদেরই ভ্রান্তি, অনিষ্ট ও অকল্যাণ। এক ব্রহ্মেরই ভিতরে তেত্রিশ কোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করিতেছে।

* * * *

যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ হও তবে হে ব্রাহ্ম! তুমি বুঝিবে তোমার ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এই হিন্দুস্থানে মূর্তি পূজিত হইতেছে। যে দিন জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর সাধন করিবে সেইদিন তুমি অনেক নূতন সত্য শিক্ষা করিতে পারেবে এবং বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। আবার যেদিন তুমি ঈশ্বরের লক্ষ্মীলাভের আরাধনা ও পূজা

করিবে সেদিন দেখিবে জগজ্জননী সত্য সত্যই তোমার সংসারের লক্ষ্মী হইয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, ধনধান্য দিয়া পরিবারের সকল অভাব মোচন করিতেছেন এবং আশ্চর্য সুকৌশলে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যেদিন তুমি ঈশ্বরকে শক্তিরূপে পূজা করিবে, সেইদিন তোমার দুর্বল মনে বলের সঞ্চার হইবে। যতই সেই আদ্যা শক্তিকে অন্তরে বাহিরে দেখিবে ততই তোমার অন্তরে বল, শক্তি, উদ্যম ও তেজ প্রস্ফুটিত হইবে।

আবার যেদিন তুমি ঈশ্বরকে অনন্ত করুণারূপে দেখিবে, সেদিন তুমি বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর অনন্ত ও সর্বব্যাপী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিতেছেন এবং পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন ধর্মবিধান প্রেরণ করিতেছেন। * * *

ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এককেতে তেত্রিশ কোটি ও তেত্রিশ কোটিতে এক অনুভব করেন। এক ব্রহ্মতে তেত্রিশ কোটি এবং তেত্রিশ কোটির মধ্যে এক ব্রহ্মকে না দেখিলে, ব্রাহ্মগণ তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম আস্বাদন করিতে পারিবে না। যদি এক ব্রহ্মতে তোমরা অসংখ্য মূর্তি না দেখিতে পাও তাহা হইলে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই।"—

ব্যাকুল নয়নে সকলে রামকৃষ্ণকে দেখছেন। নিবাত-নিষ্কম্প সমাধিস্থ তিনি। তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে আছে, স্পন্দনহীন,—নিশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। জীবনের কোনও লক্ষণ নেই যেন। অথচ মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। তাঁর দু'টি হাত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে কোলের উপর পড়ে আছে। সহজ আসনে বসে আছেন অথচ স্থাণুবৎ, যেন গভীর সুসুপ্তিতে মগ্ন। নয়নদ্বয় অর্ধনিমিলিত, স্থির। ঈষৎ মুক্ত ওষ্ঠ দ্বয়ে স্বর্গীয় হাসি খেলছে, শোভা পাচ্ছে শ্বেত মুক্তার মত দন্তপংক্তি। ওই আশ্চর্য হাসিতে এমন কিছু আছে যা কোনও শিল্পীর তুলিকায় ধরা পড়ে না।

সকলে নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন। তখন ত্রৈলোক্য সান্যাল করতাল সহ একটি গান ধরলেন। সঙ্গীত যখন গভীর রবে চতুর্দিকে বাজতে লাগল, রামকৃষ্ণ নয়ন উন্মিলত করলেন এবং এদিক সেদিক এমন ভাবে দেখতে লাগলেন যে এ এক নতুন অচেনা জায়গা। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন।

গান থামল কিন্তু তার রেশ জেগে রইল। সমবেত ব্রাহ্মভক্তদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ বললেন "এরা কারা?" তারপরই হঠাৎ জোরে জোরে মাথায় চাটি মেরে বলতে লাগলেন, "নেবে যা, নেবে যা।"

কেউ তার সমাধির কথা তুললেন না। রামকৃষ্ণ ক্রমে পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন ও মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—

শ্যামা মা কি কল করেছে,
চোদ্দ পোয়া কলের ভেতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।"—

ত্রৈলোক্যও তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। সঙ্গীত-সৌন্দর্যে সকলে আকৃষ্ট। গান থামলে রামকৃষ্ণ বললেন যে, ঈশ্বর প্রেমিক ও ভক্তের কণ্ঠস্বর কোমল, নম্র ও মিষ্টি হয়। কথাটা ত্রৈলোক্যকে উদ্দেশ্য করেই বলা।

জাহাজ এবার কলকাতা ফিরছে। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ ও হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়ে দিলেন। নামবার আগে উভয়ের প্রীতি বিনিময় হ'ল।

"আবার কবে তোমায় দেখব?" রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সময় পেলেই চলে আসব।" নম্রগলায় কেশব বলেন।

বাষ্পীয় পোত আহিরীটোলা ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রহ্মানন্দ সেখানে নেমে গেলেন। রাতে কোন ভাড়া গাড়ী পাওয়া গেল না। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট ধরে পদব্রজে কেশবচন্দ্র এগিয়ে চললেন, যাবেন কালী ব্যানার্জির বাড়ি। সেখানে তাঁর নিমন্ত্রণ আছে।[১]

১ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবরণ: Modern Review Vol- I, 1927, Page 537 39, and Vol. 1. 1928, Page 527 & 661.

## ১৬

মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর এসেছেন রামকৃষ্ণ দর্শনে। অনেকদিন থেকেই শুনে আসছেন এ'র কথা—দেখা করব করব করেও হয়ে ওঠেনি। শারদীয় অবকাশে এবার তাই মন স্থির করেই বেরিয়েছেন।[১] অশ্বিনী দত্ত যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-ঘাটে এসে উঠলেন তখন দুপুর বেলা। ঘাটেই দাঁড়িয়েছিল একটি লোক, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, পরমাহংসদেব কোথায় বলতে পারেন ?"

লোকটি উত্তর দিকের বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওই যে বসে আছেন, উনিই পরমহংস ঠাকুর।"

মহাত্মা অশ্বিনী মন্দির পানে চেয়ে ভবতারিণীর উদ্দেশে জোড় হস্তে প্রণাম নিবেদন করে, যে বারান্দায় রামকৃষ্ণ বসে আছেন, সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সারা হয়ে গেছে। কালোপাড় ধুতি পরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে অশ্বিনী দত্ত ভাবলেন, এ আবার কেমন রামকৃষ্ণ। মনে কৌতূহল নিয়ে কাছে এগিয়ে গেলেন।

পা দুটি তুলে দু হাত দিয়ে দুই হাঁটু বেষ্টন করে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধ চিৎ বসে আছেন রামকৃষ্ণ। তার বসা দেখে মনে হয় তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসা অভ্যাস নেই। ওঁর খুব কাছে ডান দিকে বসে আছেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্র মিত্র। রাজেন্দ্রবাবুর পশ্চাতে অন্যান্য কিছু লোক বসে।

বারান্দার নিকট উপস্থিত হয়ে অশ্বিনী দত্ত সকলকে নমস্কার জানালেন। তিনি দেশের এক যশস্বী ব্যক্তি, বহুলোকে তাঁকে বিশেষভাবে চেনে। রাজেন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। রামকৃষ্ণ বেশ কিছুক্ষণ মহাত্মা অশ্বিনীর দিকে চেয়ে রইলেন, কি যে দেখলেন তিনিই জানেন।

অশ্বিনী দত্তও তাঁকে লক্ষ্য করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে রামকৃষ্ণের আচরণে বেশ চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কার জন্য তিনি অধীর অপেক্ষা করছেন। কেউ বোধহয় আসবে, তাঁর আসতে দেরি দেখে তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। হাঁ ঠিক তাই। কণ্ঠে অধীরতা নিয়ে রাজেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ বললেন,

"দেখ দিকিন কেশব এল কিনা ?"

কথা শুনে অশ্বিনী দত্ত বুঝলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবের আসার কথা আছে। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়েছেন।

রাজেন্দ্রের ইঙ্গিতে একজন উঠে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বললেন, "না কেউ আসেন নি।" শুনে হাসতে হাসতে রামকৃষ্ণ বললেন, "পাতের ওপর পরে পাত, রাই বলে ওই এল বুঝি প্রাণনাথ। হাঁ, দেখ কেশবের কি এই রীতি! আসে, আসে,— আসে না।"

---

১ সময়টা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশবচন্দ্র, সদলে এসে পৌঁছলেন, তাঁর মুখে হাসি।

অপার্থিব এক ঝলক হাসি রামকৃষ্ণেরও সারা মুখে ছেয়ে গেল। এ হাসি যে না দেখেছে সে বর্ণনায় বুঝাতে পারবে না। যেমন জননী অনেক দিনের পর প্রিয় পুত্র দর্শনে আনন্দিত হন, রামকৃষ্ণের চোখে মুখে সেই রকমই আনন্দ। কেশবচন্দ্রকে দেখা মাত্রই তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন। অভিমান ছোঁওয়া গলায় বললেন, "কেশব তুমি কত দেরি করলে বলত? আমি ভাবলুম তুমি বুঝি আজ এলেনা। সেজন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল।"

কেশবচন্দ্র সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে তিনি আজ দক্ষিণেশ্বর আসবেন।

রামকৃষ্ণের হাত দুটি ধরে তাঁর মুখপানে প্রীতির চোখে চাইলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব, তারপর ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম জানালেন সকলকে। রামকৃষ্ণ তদ্রূপ প্রণতি জানিয়ে কিছু পরে মাথা তুললেন। দেখা গেল তিনি সমাধিস্থ, সমাধিস্থ অবস্থাতেই বলেছেন,—

"রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমি কিনা বক্তৃতা করব, তা আমি পারব টারব না। করতে হয় তুমি কর, আমি এসব পারব না।" ঐ অবস্থাতেই দিব্য-হাসি হেসে বললেন, "আমি তোমার খাব দাব. থাকব। আমি তোমার খাব শোব আর বাহ্যে যাব। আমি ওসব পারব না।"

কেশব তন্ময় হয়ে রামকৃষ্ণকে দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন। এক একবার ভাবের ভরে 'আঃ', 'আঃ' করে উঠছেন।

মহাত্মা অশ্বিনীও সব কিছু লক্ষ্য করছেন। রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা দেখে তিনি সংশয়-দোলায় দুলছেন। ভাবছেন, "একি ঢং"? ব্যাপারটা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন—বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে এলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, "কেশব, মনে আছে একদিন তোমার ওখানে গেছলুম। তুমি উপাসনা করলে, 'ভক্তিনদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব'। আমি তখন চিকের আড়ালে মেয়েদের দেখিয়ে বললাম. 'তাহলে এ'দের দশা কি হবে?" তোমরা গৃহী একেবারে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে কি করে পড়বে? সেই নউলের মত, পেছনে বাঁধা ইঁট, কোন কিছু হলে কুলঙ্গায় উঠে বসল; কিন্তু বসে থাকবে কেমন করে; ইঁটে টানে আর ধুপ করে নেমে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান করতে পার, কিন্তু দারা সুত ইঁট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে; এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি করে?"

কথার পুনরাবৃত্তি করে রামকৃষ্ণ মৃদু মধুর হাসলেন। একথা আরও একবার কেশবচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন।

কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, "কেন গৃহস্থের কি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র" বলে মহর্ষির উদ্দেশে দু'হাত জোর করে প্রণাম জানালেন রামকৃষ্ণ, তারপর বললেন,

"তা জান, এক জনার বাড়ি দুর্গোৎসব হত: উদয়স্ত পাঠাবলি হ'ত, কয়েক বছর পর সেখানে আর বলির ধুমধাম নেই। একজন জিজ্ঞাসা করলে 'মশাই আজকাল

যে আপনার বাড়িতে বলির ধুমধাম নেই ?' সে বললে, 'আরে, এখন দাঁত পড়ে গেছে।' দেবেন্দ্রও এখন ধ্যান ধারণা করছে, তা করবেই তো। তা কিন্তু খুব মানুষ।"

তারপরই, তিনি আবার বললেন, "দেখ যতদিন মায়া থাকে ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মত। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হয়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ঐ শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়, তখন শাঁসটা ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা আর শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না।"

"এই যে আমি টে" কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, "ওইটাই বড় মুস্কিল বাধায়। শালার আমি কি যাবেই না ? পোড়ো বাড়িত অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, খুঁড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দেখ ফেকড়ি গজিয়েছে। ঐ আমি' অমনধারা। পেঁয়াজের বাটি, সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবে না ?"

কি একটা কথা বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ থেমে গেলেন হঠাৎ, তারপর কেশবচন্দ্রকে বললেন, "হাঁ, কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে, ঈশ্বর নেই। বাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর এক পা ফেলতেই, 'উঃ পাশে (বুকে) কি হল' বলেই অজ্ঞান। ডাক, ডাক, ডাক্তার ডাক। ডাক্তার আসতে আসতেই হয়ে গেছে। এ্যা, এরা বলে ঈশ্বর নেই।"

সবাই হতবাক হয়ে কথা শুনছেন;—অশ্বিনী দত্ত মন্ত্রমুগ্ধ।

কিছুক্ষণ পর রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে বললেন "কি গো, কিছু হবে ?'

কেশবচন্দ্র তক্ষুনি বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

"কিছু হবে কি ?"—মানে ঈশ্বরের নামামৃত রূপ কারণবারি পান হবে কিনা রামকৃষ্ণ এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

কীর্তনগান আরম্ভ হ'ল। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র দুজনে গানের সঙ্গে নৃত্যরত হলেন। উভয়ে কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে দু'জনে গান গাইছেন—

"মা আমাদের আমরা মায়ের আদরের ধন,
তাঁর প্রেম বাঁধা সব বঙ্গবাসীগণ।
ভ্রাতৃপ্রেম মহোৎসবে, প্রাণে প্রাণে মিলে সবে
গাও ভীমরবে জয় বন্দে মাতরম্॥"

এ স্বর্গীয় দৃশ্যের তুলনা নেই ! নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে হঠাৎ রামকৃষ্ণ স্থির হয়ে গেলেন। সমাধিস্থ। বেশ কিছু সময় এভাবে গেল। তিনি স্থির—স্থাণুবৎ। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত অবাক হয়ে রামকৃষ্ণকে দেখছেন। ভাবছেন—হাঁ, এই ঠিক ঠিক পরমহংস বটে। মহাপুরুষদ্বয়ের মিলনানন্দ দেখে আপনাকে ধন্য মনে করলেন অশ্বিনী দত্ত। রামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল ধীরে ধীরে।

গান শেষ হলে সকলে জলযোগে বসলেন। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরিচিত। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হল। কেশবচন্দ্র হাসিমুখে বললেন, আমরা মিলেছি আজ এক জায়গায়। আমরা যে একই পথের পথিক।"

জোর করে অশ্বিনী দত্ত বসে আছেন। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের কথার উত্তরে ঠাট্টা

করে বললেন, "সে কিগো এক পথ কই? তুমি আছ নিরাকারে, আর আমি সাকারেই আছি নিরাকারেও আছি।"

"না, না আপনি আমার হয়ে আছেন।"

কেশবের কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

এরপর আলাপ-আলোচনার মাঝে কে একজন জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় জানতে চাইলেন।

"ওঁকে বল, উনি বুঝিয়ে দেবেন।" কেশবচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি তুলে দেখালেন রামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র তখন ভক্তটিকে জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের বিষয় বুঝিয়ে দিলেন, তারপর রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, "আমরা আপনার কথা শুনতে এসেছি, আপনি বলুন।"

বিনয়ে কম যায় না কেউ। রামকৃষ্ণ হাসছেন মৃদু মৃদু। এমন অনেকবার হয়েছে। ক্রমাগত কথা বলে যাওয়ার সময় ছাড়া কখনও যদি কেউ রামকৃষ্ণের কাছ থেকে তত্ত্বকথা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তো তিনি হয়তো বা কখনও সম্মুখে উপাস্থিত কেশবচন্দ্রকে দেখিয়ে বলতেন "ওকে বল।" কেশব হয় বুঝিয়ে দেন না হয় বিষয় সহকারে রামকৃষ্ণকেই বলতে বলেন। কারণ তিনি জানেন সহজ সুন্দর উপমায় রামকৃষ্ণ এমন মধুর ভাবে বলেন যে তা মনে একেবারে গেঁথে যায়। কত সময় কেশবচন্দ্র তাঁর কথা ব্যাখ্যা করে অপরকে বোঝান।

রামকৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, "সংসারী জীবের সাধুসঙ্গ দরকার। কামিনী আর কাঞ্চন এ দুটিই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।" তারপর কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, "সংসার ত্যাগী না হলে ঠিক লোক শিক্ষা দেওয়া যায় না। এদিক ওদিক দুদিক রাখা বড়ই মুস্কিলের। তুমি বিয়ে করেছ, সংসারী। তাই তোমার লোক শিক্ষার ব্যাঘাত হচ্ছে। তবে ঈশ্বর তোমায় শক্তি দিয়েছেন"।[১]

কেশচবন্দ্র নতমুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনছেন। সংসার তাঁর কাছে কত যে বিরাগের বস্তু এ কথা তার চেয়ে কে বেশি জানে। রামকৃষ্ণ অনেকবার এ ইঙ্গিত করেছেন।

তারপর তিনি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, বললেন, "তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ। মানুষ কি কম গা। ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে। অন্য জীব কিন্তু পারে না। অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে আবার সর্বভূতে তিনি বিরাজিত কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ। অগ্নিতত্ত্ব সর্বভূতে আছে সব জিনিসে আছে কিন্তু কাঠে বেশি প্রকাশ।"

ইতিপূর্বে অনেকবার এই উপমার উল্লেখ করেছেন তিনি। সকলে আশ্চর্য হয়ে শুনেছে, আজও শুনল।

---

১ রামকৃষ্ণ বলতেন, "কেশব কি রকম গা? ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধ ভগবানের বিশেষ শক্তি ওর ওপর। তাকে কত লোকে গণে মানে, বিলাত পর্যন্ত জানে, স্বয়ং কুইন (মহারাণী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে, মেনেছে তাকে। শাস্ত্রে বলেছে যাকে অনেকে গণে মানে সেখানে ঈশ্বরের শক্তি। তাঁর কৃপা না হলে এমনটি হয় না। [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), ৫ম সংস্করণ পৃঃ ২১৯]

অশ্বিনী দত্ত ভাবছেন রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধুর মিলন দৃশ্যের কথা। এ'দের দু'জনকে দেখে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। তিনি যখন মহাপুরুষ দুজনের কথা ভাবছেন তখন রামকৃষ্ণের কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন :—

"সংসারে দাসীর মত থাকবে। দাসী সব কাজ করে কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশে। মনিবের ছেলেদের মানুষ করে, বলে 'আমার হরি, আমার রাম ; কিন্তু জানে ছেলে তার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন কর এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধনা করেছিলেন। সাধনা করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।" তারপর কেশবের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা বক্তৃতা কর সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করে, ঈশ্বর দর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে লোক শিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বর লাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর লাভ যে হয়েছে তার লক্ষণ আছে—বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়। যেমন শুকদেব, চৈতন্যদেব, কখনও বালকের মত, কখনও উন্মাদের মত নৃত্য করতেন। হাসে কাঁদে, নাচে, গায়। পুরী ধামে চৈতন্যদেব যখন ছিলেন তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন।"

কেশবচন্দ্র বললেন, "চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের কথা আরও বলুন।"

—"সে কথা বললে তুমি কিন্তু আর দল রাখতে পারবে না।"

—"তবে থাক।"

এরপর রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের সঙ্গেও নানা আলাপ-আলোচনায় রত হ'লেন। ঈশ্বরীয় নানা কথার মধ্যে দিনটি কেটে গেল।

সিমলা স্ট্রীটের ২৩ নং বাড়িটি আজ উৎসব মুখর। বাড়িটি দ্বিতল। ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বাড়ি। ওখানে আজ রামকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ। কেশবচন্দ্র, রাম দত্ত, রাজেন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্য সান্যাল এ'রাও সকলে নিমন্ত্রিত। শীতকালের অপরাহ্ন।[১] দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রায় বিকেল চারটায় ভক্তদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ এসে পৌঁছুলেন। মনোমোহন ও ঈশান মুখুজ্জে তাঁকে সযত্নে একতলার বৈঠকখানা ঘরে বসালেন। রামকৃষ্ণ বালকের মত হাসছেন আর ঈশান চন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন। একবার কথার মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন' "হাঁগা কেশব কখন আসবে?"

"তাঁর তো এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা।" মনোমোহন বললেন।

যেখানে কেশবচন্দ্রের আসার কথা থাকে সেখানেই রামকৃষ্ণের অধীর প্রতীক্ষা। তিনি যতক্ষণ না কেশবকে দেখবেন ততক্ষণ অস্থির হবেন। আশ্চর্য ভালবাসা! কেশব যে ওঁর মনের মানুষ।

কিছুক্ষণ পরই ব্রাহ্মভক্তদের নিয়ে কেশবচন্দ্র এসে পৌছুলেন। মনোমোহন ও রাজেন্দ্র তাঁদের সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। রামকৃষ্ণ ও উপস্থিত অন্যানাদের কেশবচন্দ্র ভক্তি সহকারে নমস্কার জানালেন। রামকৃষ্ণও প্রতি নমস্কার করলেন সকলকে। রামদত্ত ওঁর ডান দিকে বসেছেন. কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের ডান হাতটি ধরে তাঁর বামদিকে উপবেশন করলেন।

ভাগবৎ পাঠ হচ্ছে পাঠক সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন। সকলে একাগ্রমনে শুনছেন। পাঠ শেষ হ'লে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের মুখপানে চাইলেন।

প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ভক্তজন মণ্ডলাকারে বসে আছেন। মৃদু হেসে মধুর কণ্ঠে রামকৃষ্ণ বললেন, "সংসারের কর্ম বড় কঠিন। বন্ বন্ করে ঘুরলে মাথা ঘুরে যেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে; সংসার তেমন বন্‌বন্ করে ঘোরায়। তবে খুঁটি ধরে ঘুরলে আর ভয় নেই। কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরকে ভুল না।"[২]

তোমার জনম-জীবন-মরণের পরিচালক ভগবান। তাঁর লীলার জন্যই তোমার সৃষ্টি। তাঁকে উপলব্ধি করার জন্যই, তাঁর মধ্যে লীন হওয়ার জন্যই তোমার জীবন। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে ঠিক ঠিক সংসার ধর্ম করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। তারই ইঙ্গিত দিয়ে রামকৃষ্ণ উপায় বাতলে দিচ্ছেন;—

—"যদি বল, যে কালে (এটা) এত কঠিন, উপায় কি? না উপায় আছে। উপায় অভ্যাস যোগ।" উপমা দিয়ে বলছেন, "ওদেশে ছুতরদের মেয়েদের দেখেছি তারা একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ঢেঁকি পড়বার ভয় আছে হাতে, আবার ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খরিদ্দারদের সঙ্গে কথা কইছে, বলছে তোমার কাছে এত পাওনা আছে

১ শনিবার ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৮০

দিয়ে যেও। এত কাজের মধ্যেও নজরটি কিন্তু আছে ঢেঁকির দিকে।" আবার বললেন, "এই যেমন নষ্ট মেয়ে, সংসারের সব কাজ করে কিন্তু সর্বদা উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে।[১]

কি গভীর অর্থবহ অথচ সহজ, সরল কথা। এমন না হ'লে পরমপুরুষ—লোক গুরু!

কেশবচন্দ্র একাগ্র হয়ে রামকৃষ্ণের কথা শুনছেন। তিনি পুলকিত ও বিস্মিত। তাঁর মনে রামকৃষ্ণের উপমার অলঙ্কারগুলি ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে বাজছে। সকলেই নীরব শ্রোতা।

ইষৎ বিরতির পর রামকৃষ্ণ আবার বলতে আরম্ভ করলেন ;—

"তবে এটুকু হবার জন্য একটু সধন চাই। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ভক্তি লাভ করে কর্ম করা যায়। শুধু কাঁঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগবে। হাতে তেল মেখে ভাঙ্গলে আর আঠা লাগবে না।"

হাতে তেল মাখতে হবে কাঁঠাল ভাঙ্গবার আগে। সংসার ধর্ম করতে করতে ভক্তির রসে হৃদয়কে মাখিয়ে নিতে হবে। তাঁর জন্য চাই সাধনা—নিরন্তর কর্ম করা। ক্রমে ক্রমে কর্ম অভ্যাস হয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ নীরব হলেন। এবার গান হবে, সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন। সকলে প্রাঙ্গণে সমবেত। খোল করতাল ধ্বনির সঙ্গে কীর্তন আরম্ভ হল ;—

"জয় জয় আনন্দময়ী, বিশ্বজননী।
পাপ তাপ হারিনী, সুখ-মোক্ষদায়িনী।
স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য শান্তি শুভদাত্রী,
গৃহসংসারের কর্ত্রী দুঃখনাশিনী।
মধুর কোমলকান্তি, বিমল রজত ভাতি,
মহাশক্তি চিণ্ময়ী অনন্তরূপিণী,
বসিয়ে হৃদয়াসনে, আনন্দ ঘন বরণে
মোহিত করিছ মা ভুবন মোহিনী।"[২]

সকলে কীর্তনানন্দে মত্ত। আনন্দে আসন থেকে রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। হাতে তালি বাজিয়ে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করতে লাগলেন ও উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সুরে সুর মেলালেন—

"জয় জয় আনন্দময়ী, বিশ্বজননী।"

চতুর্দিকে সঙ্গীতের সুর-তরঙ্গায়িত হতে লাগল। শীতকাল, তবু রামকৃষ্ণ ঘেমে উঠেছেন। কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে দুলে দুলে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে নাচছেন আর হাসছেন স্বর্গীয় হাসি। এ দৃশ্য যে দেখছে পুলকে তার সর্বাঙ্গ পুলকিত হচ্ছে, সার্থক হচ্ছে জীবন। কেশবচন্দ্র ভাব-বিহ্বল। চতুর্দিকে স্বর্গীয় আনন্দ উপচে পড়ছে।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম) ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট পৃঃ ৮১

২ গানটি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা।

কীর্তন গান একসময় শেষ হ'ল। তার রেশ রইল জেগে বেশ কিছুক্ষণ। মনে হচ্ছে ভক্তজনের আকুল আহ্বানে মা আনন্দময়ী যেন অবতীর্ণ হয়েছেন, আড়ালে আর বুঝি থাকতে পারেন নি। সকলে উপবেশন করলে পর রামকৃষ্ণ কিছু খেতে চাইলেন। বাড়ির ভেতর থেকে একটি থালায় মিষ্টান্ন এ'ল। কেশব থালাটি আপনার হাতে ধরে রইলেন।

রামকৃষ্ণ খাচ্ছেন। কেশবচন্দ্র জলের গ্লাস ধরে তাঁকে জল খাইয়ে দিলেন ও গামোছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলেন।

"কি গো কেশব, তোমার কি মত ? তুমি কিছু বল।"

—মধুর স্বরে রামকৃষ্ণ বললেন।

—"আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে, আপনি বলুন।"

কেশবচন্দ্রের কথায় রামকৃষ্ণ বললেন, "যারা সংসারে থেকে তাঁকে ডাকতে পারে তারা তাঁর ভক্ত। মাথায় বিশমণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। এরই নাম বীর ভক্ত।" তারপর তিনি সংসারে থেকে ধর্মলাভ হয় কিনা তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

"যদি বল এটি অতি কঠিন কাজ। কঠিন হলেও ভগবানের কৃপায় কি না হয়। অসম্ভবও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে সেকি একটু একটু করে আসবে ? একেবারে ঘর আলোকিত হবে।"

তাঁর ইচ্ছাতেই জগৎ-সংসার চলছে। তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছু ঘটছে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, হাতী পঙ্কে বদ্ধ হয় তাঁরই ইচ্ছায়। কেবল তাঁকে ভালবাস, তাঁকে ডাক।

রামকৃষ্ণের কাছে আশার বাণী শুনে সকলের মুখে হাসি, বুকে আনন্দ। আর এগুলো তো কেশবচন্দ্রের অন্তরেরই কথা। যে কথা তিনি বলেছেন, বলতে চেয়েছেন রামকৃষ্ণ তা আরও স্পষ্ট, সহজ ও সুন্দর করে দিচ্ছেন।

টুকরো টুকরো কথার মধ্যে কেশবচন্দ্র রাজেন্দ্র মিত্রের দিকে চেয়ে একবার বললেন, "আজ দিনটা আনন্দে গেল। আপনার বাড়িতে এরকম একদিন করুন না বেশ হয় তা হলে।"

"খুব ভাল কথা। আমার সৌভাগ্য" ''বিনীত উত্তর দিলেন রাজেন্দ্র। তারপর শ্যালিকা পুত্র রাম দত্তের দিকে চেয়ে বললেন, "রাম, তোমার ওপর সব ব্যবস্থা করার ভার রইল।"

"আচ্ছা"—। রাম দত্ত উত্তর দিলেন।

কিছুক্ষণ পর রামকৃষ্ণকে মনোমোহন উপরে অন্তপুরে নিয়ে গেলন। সেখানে তার সেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আহারের সমস্ত আয়োজন করেছেন মনোমোহনের জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী। রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করলেন। নানা মিষ্টান্ন ও উপাদেয় খাদ্য দেখে হাসতে লাগলেন, খেতে খেতে বললেন, "এত করেছ ? আবার বরফ দেওয়া জল ?" এক গ্লাস বরফ দেওয়া জলও কাছে রাখা ছিল। রামকৃষ্ণ বরফ দেওয়া জল খেতে ভালবাসেন। আজ তিনি স্বল্পাহার করলেন। সব পদই একটু করে মুখে দিলেন, শ্যামাসুন্দরী যত্ন করে রেখেছেন, তাঁর মনে কষ্ট হতে পারে।

কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য অভ্যাগতদের খাওয়ার ব্যবস্থা নীচে প্রাঙ্গণে করা হয়েছে, সেখানে সকলে সারবন্দী হয়ে খেতে বসেছেন। রামকৃষ্ণ নীচে নেমে এসে তাঁদের খাওয়াতে লাগলেন। তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য, লুচি মোণ্ডার গান গাইলেন। সবাই হাসতে হাসতে আনন্দে আহার সমাধা করলেন। খাওয়া দাওয়ার- পর্ব শেষ হলে রামকৃষ্ণ বললেন, "এবার যাব।" কেশবচন্দ্র ও অন্যান্যরা তাঁকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

১৮

ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব চলছে। এরই মধ্যে একদিন কেশবচন্দ্র কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত নিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে এলেন। তার আগেই মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত এসেছেন, এবং রামকৃষ্ণের কাছে বসে আছেন। এত দিনে তিনি রামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত হয়েছেন। ওঁরা রামকৃষ্ণের ঘরে বসে শুনতে পেলেন গঙ্গাবক্ষ হতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে মাতৃনাম গান ভেসে আসছে—

"কত ভালবাস গো মা, মানব সন্তানে।
( পাপী ) মনে হ'লে প্রেমধারা ঝরে দু'নয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি
তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম-নয়নে
ডাকিছ মধুর বচনে।
মনে হলে প্রেমধারা বহে দু'নয়নে।
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা
প্রেমবাহু প্রসারিয়ে, স্নেহে বিগলিত হয়ে,
আয় আয় বলে,
অপরাধ ক্ষমা করে, হাসি মুখে প্রেমভরে
( ওমা আনন্দময়ী )
তোমার প্রেমের ভার বহিতে পারি না গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মাগো তব শ্রীচরণে।"—

খোল, করতাল সহ গান হচ্ছে। গানটি বেঁধেছেন ত্রৈলোক্য সান্যাল। ভাগীরথীর কলধ্বনির সঙ্গে কীর্তন ও বাদ্যের সুললিত ধ্বনি ভেসে যাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর পতাকায় ও নানা রংয়ের ফুলে জলযানটি সুশোভিত। ফুলের সৌরভ বাতাসের মৃদু দোলায় দুলে দুলে চারি পাশকে মাতিয়ে রেখেছে।

নিজের ঘরে বসে রামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলছেন। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত সেখানে বসে। তিনি লক্ষ্য করলেন সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আসা মাত্র রামকৃষ্ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং হৃদয়াবেগ চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলেন, "ওরে, দলবল নিয়ে কেশব আসছে রে—কেশব আসছে।" গঙ্গার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। ভক্তরা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃথা। অশান্ত শিশুর মত মানুষটিকে শান্ত করা গেল না। উত্তেজনায় উচ্চকণ্ঠে রামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "বুঝতে পারছ না এমন কেত্তন কেশবের দল ছাড়া আর কে গাইবে?" এই কথা বলে তিনি তক্ষুণি প্রায় দৌড়ে ঘাটের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন।

রামকৃষ্ণকে ধরে রাখা যায় না, জাহাজে উঠবার জন্য তিনি খুবই অস্থির হয়ে

উঠেছেন। তাঁর একজন প্রিয় ভক্ত বললেন, "ঠাকুর আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? ওঁরা এখানেই তো নামবেন।" রামকৃষ্ণ হেসে তাঁকে বললেন, "ফিরে যাও, রাধা যাচ্ছে শ্যামের কাছে।"

রামকৃষ্ণকে ধরাধরি করে জাহাজের মধ্যে নিয়ে আসা হ'ল। উনি জাহাজ অভ্যন্তরে পদার্পণ করেই ভাবাবেগে কেশবচন্দ্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং বেশ উত্তেজিত ভাবেই দু'বার বলে উঠলেন,—

"তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা।"—

দু'জনার এই স্বর্গীয় মিলনদৃশ্য দেখে সকলে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। এ দৃশ্য অপূর্ব।

সেদিন কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের নিয়ে ভাগীরথী বক্ষে বেড়ালেন ও ঈশ্বরানন্দে দিনটি কাটালেন।

এর কিছুদিন পরই মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর পাশে বসলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ও পরে বললেন,

"সেই যে কাক্ খুললে ফস্ ফস্ করে ওঠে, একটু টক, একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার ?

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "লেমনেড ?"

"হাঁ, একটা এনে দাও না।" শিশুর আবদার রামকৃষ্ণের কণ্ঠে।

অশ্বিনী দত্ত একটা লেমনেড আনিয়ে দিলেন। ঘরে বিশেষ কেউ নেই। ভোলানাথ রামকৃষ্ণ আনন্দে লেমনেড খেলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল তৃপ্ত পেয়েছেন।

এক সময় অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনার কি জাতি ভেদ আছে ?"

কথা শুনে রামকৃষ্ণ হাসলেন, বললেন, "কই আর আছে, কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি"; তারপর আবার বললেন, "তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছে হ'ল না। আবার একটু পরে আর একজন এল, তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে ক্যাচড় ম্যাচড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জান, জাতি ভেদ আপনি খসে পড়ে, যেমন নারকোল গাছ, তাল গাছ, বড় হয়, বালতো আপনি খসে পড়ে। জাতি ভেদ আপনি খসে যায়, টেনে ছিঁড়ো না।"

ক্রমে কেশবচন্দ্রের কথা উঠল। মহাত্মা অশ্বিনী কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, কেশববাবু কেমন লোক ?"

"ও গো সে দৈবী মানুষ।"—

"আর ত্রৈলোক্যবাবু ?"

মৃদু হেসে রামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "বেশ লোক, বেড়ে গায়।"

তারপর দু' একটি কথা জিজ্ঞাসার পর অশ্বিনী দত্ত জানতে চাইলেন, "হিন্দুতে ব্রাহ্মতে তফাৎ কি ?"

রামকৃষ্ণ বললেন, "তফাৎ আর কি। এইখানে রোশন চৌকী বাজে একজন সানাইএর পো ধরে থাকে আর একজন তাঁরই ভেতর "রাধা আমার মান করেছে,' ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মরা নিরাকারের পো ধরে আছে আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।

"জল আর বরফ, নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়। জ্ঞানের গরমে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।"

একটু থেমে আবার বললেন, "সেই একই জিনিস নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চার-পাশে চার ঘাট। এ ঘাটের লোকে জল নিচ্ছে, জিজ্ঞাসা কর, বলবে 'জল'। ও ঘাটের যারা জল নিচ্ছে বলবে 'পানি', আর এক ঘাটে 'ওয়াটার', আর এক ঘাটে 'অ্যাকোয়া'—জলতো একই।"

সেই একই নানা নামে বহু হয়েছেন।

ঠন্‌ঠনে বেচু চাটুয্যের গলিতে রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। মনোমোহনের বাড়িতে মিলনোৎসবের দিন কেশবচন্দ্র রাজেন্দ্রকে বলেছিলেন যে এ ধরণের এক মিলন-উৎসব তাঁর ( রাজেন্দ্রর ) বাড়িতে করলে বেশ হয়। কেশবচন্দ্রকে রাজেন্দ্র খুব শ্রদ্ধা করেন। তাই আনন্দের সঙ্গে মিলনোৎসবের আয়োজন করেছেন। সম্মেলনের দিন ঠিক হয়েছে শনিবার, ১০ই ডিসেম্বর।[১] মনোমোহনের বাড়িতে যাঁরা অতিথি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলকেই বলা হয়েছে, রামকৃষ্ণ আসছেন, কেশবচন্দ্র আসছেন, আর আসছেন অন্যান্য ভক্তরা।

রাজেন্দ্রের মনে খুব আনন্দ। এমন সময় খবর পেলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ভাই অঘোরনাথ লক্ষ্ণৌ প্রদেশে ধর্মপ্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় হঠাৎ মারা গেছেন, সেজন্য কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভাইরা অশৌচ নিয়েছেন। খবরটা নিয়ে এলেন উমানাথ। রাজেন্দ্র মহা ভাবনায় পড়লেন। অঘোরনাথ মারা গেছেন ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, আজ শুক্রবার ৯ই তারিখ, আগামী কাল সম্মেলনে তবে কি কেশবচন্দ্র আসতে পারবেন না? তিনি না এলে উৎসবের অঙ্গহানি; তাঁরই ইচ্ছাতে এই মিলন-উৎসবের আয়োজন।

চিন্তিত রাজেন্দ্রকে রাম দত্ত আশ্বাস দিলেন, "মেসোমশাই, আপনি কেন ভাবছেন? কেশববাবু নাই বা এলেন। পরমহংস মহাশয় আসছেন। তিনি সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যার আনন্দে জগৎ সংসার আনন্দিত তাঁকে আস্বাদন করেছেন।"

রামের কথাটি রাজেন্দ্রের মনে ধরল না। তিনি বললেন, "চল কেশববাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি।"

এ কথা বলে রাজেন্দ্র রামদত্ত, রাজমোহন ও মনোমোহনকে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গৃহে দেখা করলেন।

সব শুনে কেশব বললেন, "কই, আমি তো এমন কথা বলিনি যে যাব না? অবশ্য যাব। অশৌচ হয়েছে তা আলদা জায়গায় বসে খাব।"

যদি ঈশ্বরকে ভালবাসা, যদি তাঁরই জন্য ব্যাকুল হওয়া, তবে যিনি সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে তাঁরই আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন, তাঁকে দেখতে যাওয়া যে অশেষ পুণ্য, চরম আনন্দের ব্যাপার। তা যতই থাক মালিন্য, যতই থাক অপারকতা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত। জলচৌকির উপর ধূপাধারে ধূপ জ্বলছে, মৃদু সৌগন্ধে ঘর আমোদিত। ঘরের দেওয়ালে রামকমল সেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের ছবি টাঙ্গান, তাছাড়া শোভা পাচ্ছে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে রামকৃষ্ণর একটি ভাব-সমাধিচিত্র।

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

কেশব রাজেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের কিছু মিষ্টান্নপরিবেশন করা হয়েছে। তাঁরা খাচ্ছেন। আলোচনায় রামকৃষ্ণের কথাই হচ্ছে। কেশবচন্দ্র বলছেন, রামকৃষ্ণ যেন মাখনের মত নরম। এমন কোথাও নেই, যেন ঘনিভূত ঈশ্বর প্রেম।

শেষে আরও বললেন, "ইনি এত সহজ যে এ'কে বোঝা বড় কঠিন।"

রাজেন্দ্র বললেন, "অনেকেই তো ওঁকে চৈতন্যের অবতার বলছেন।"

"হাঁ, তিনি নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরীর চৈতন্য", কেশবচন্দ্র উত্তরে বললেন ; তারপর দেওয়ালে টাঙ্গানো সমাধিচিত্রটি দেখিয়ে বললেন, "এমন সমাধি দেখা যায় না। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য এ'দের হ'ত।"

রাজেন্দ্রও হতবাক হয়ে কেশবচন্দ্রের মুখপানে চেয়ে রইলেন, ভাবলেন এমন সুন্দর মানুষও দেখা যায় না কেশবচন্দ্র যেমন। তারপর আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর বিদায় জানিয়ে আসন ত্যাগ করলেন ওরা তিনজন। কেশবচন্দ্র পুনরায় জানালেন যে উৎসবে তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।

* * * *

নির্দিষ্ট দিনে বেলা তিনটেয় রামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে রওনা হলেন। প্রথমে এসে উঠলেন মনোমোহনের বাড়ি। সেখানে বিশ্রাম করে কিছু খেলেন। এখনও হাতে অনেক সময় আছে, রাজেন্দ্রর বাড়ি কিছু পরে গেলেও চলবে।

সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণকে বললেন, "আপনি ছবি তোলার কল দেখবেন বলেছিলেন, চলুন আপনাকে কল দেখিয়ে আনি।"

ছবি তোলার কল দেখতে বড় ইচ্ছা রামকৃষ্ণের, সে কথা অনেকবার জানিয়েছেনও ; বললেন, "বেশ তো চল, ওই কল দিয়ে কেমন ছবি তোলা হয় দেখব।"

সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণকে গাড়ী করে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন।

বেঙ্গল স্টুডিও। চারি ধারে নানা ভঙ্গিমার ছবি, নানা মুখের ছবি টাঙ্গান। বড়, মাঝারি, ছোট নানা বাঁধান ছবি। ভেতরে ডার্করুম। রামকৃষ্ণ ছবি তোলা দেখবেন এ কথা শুনে ছবিওয়ালা কৃতার্থ। যিনি জগন্মাতার তৈরী কল থেকে মুক্তির উপায়ের ঠিকানা দেন, তিনি আজ এসেছেন মানুষের তৈরী কলের ক্রিয়া দেখতে।

ফটোগ্রাফার কেমন করে ছবি তোলা হয় রামকৃষ্ণকে তা দেখাতে ব্যস্ত হলেন।

"এই কাচ, এর পেছনে কালি যার নাম সিলভার নাইট্রেট, তাই মাখান হয়, তারপর ছবি ওঠে।"

সুরেন্দ্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে চোখে চোখে ইশারায় ঠিক হ'ল যে রামকৃষ্ণের একটা ছবি নেওয়া হবে। ফটোগ্রাফারকে রামকৃষ্ণের অগোচরে সে কথা জানান হ'ল। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে বিপত্তি, তার আগেই হঠাৎ রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি ঘটল। সুতরাং কি আর করা যাবে। এ অবস্থাতেই ছবি তোলা যাক, ছবির সঙ্গে ধরা পড়ুক ঈশ্বর বিভূতি।

সমাধি অবস্থাতেই ছবি তোলা হল রামকৃষ্ণের। তারপর বেঙ্গল স্টুডিও থেকে সকলে রাজেন্দ্রের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন।

বাড়ির উঠানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। পাঠ করছেন মহেন্দ্র গোস্বামী, সেকালের প্রসিদ্ধ ভাগবত-পাঠক ও কথক। রামকৃষ্ণ এদিক-ওদিক চাইছেন। তাঁকে দেখে মনে

হচ্ছে যেন কিছু অস্থির। স্টুডিও ঘরেই তিনি ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, এখনও বিমনা মনে হচ্ছে। কেশবচন্দ্র এখনও এসে পৌঁছান নি। সবাই ঘরে এসে ফরাসে উপবেশন করলেন। ভাবের ঘোরে রামকৃষ্ণ বললেন, "সংসারে থেকেও ভগবানকে লাভ করা যায়। হবে না কেন? তবে বড় কঠিন কাজ। আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম, কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বাঁধন ছিঁড়লে পুলের কিছুই হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে, তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ছাড়া সে যাবার উপায় নেই।"

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "সে কৃপা কি সকলে পায়? সবার হয়?"

—"কেন হবে না, তাঁকে মনে প্রাণে ডাকলেই হবে। তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নেই। তাঁর মায়ার ভেতর বিদ্যা, অবিদ্যা দুই আছে। দর্শনের পর নির্লিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ হয়। দুধে জলে আছে, হাঁস যেমন দুধ নিয়ে জল ত্যাগ করে। হাঁস পারে কিন্তু শালিখ পারে না।"

আর একজন ভক্ত জানতে চায়, "তবে সংসারীর উপায় কি?"

—"উপায় আছে বৈকি," বললেন রামকৃষ্ণ, "গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তাঁর বাক্য অবলম্বন, তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোর, সংসারের কাজ কর। গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করতে নেই। সচ্চিনন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুর কৃপায় ইষ্টকে দর্শন হয়। তখন গুরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান।"[১]

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

"সরল বিশ্বাসে কি না হয় বল?" রামকৃষ্ণ বলে চলেছেন,

—গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে শিষ্যরা যে যেমন পারে উৎসবের আয়োজন করছে। একটি গরীব বিধবা, সেও শিষ্য। তার একটি গরু আছে, সে একবাটি দুধ এনেছে। গুরু মনে করেছিলেন যে দুধ আর দই এর ভার এই মেয়েটি নেবে। তাই মাত্র একবাটি দুধ দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলেন টান মেরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ধুৎ, তুই জলে ডুবে মরতে পারিস নি।' মেয়েটি এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীতে ডুবে মরতে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন আর প্রসন্ন হয়ে বললেন, "এই নাও এই পাত্রে দই আছে, যতই ঢালবে ততই বেরুবে। যাও এবার তোমার গুরু সন্তুষ্ট হবে।" মেয়েটি সেই এনে গুরুকে দিল। আরে! গুরু তো অবাক। "বল কোথা থেকে পেলি এটা, কে দিল তোকে?" নানারকম প্রশ্ন। মেয়েটি সমস্ত ঘটনা বলল। "চল্ নদীর ধারে।" গুরু নদীর ধারে তাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ওরে তুই তাঁর কৃপা পেয়েছিস, এবার নারায়ণকে আমায় দেখা, না হলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব।" মেয়েটির ডাকে নারায়ণ দেখা দিলেন কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি তখন বলল, "প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দাও আর তার শরীর যদি না থাকে তবে আমিও শরীর ত্যাগ করব।" তখন নারায়ণ গুরুকে দেখা দিলেন। দেখ গুরুভক্তি থাকলে নিজেরও ঈশ্বর দর্শন হয়, আবার গুরুদেবের হয়।"[২]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৮২

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট পৃঃ ৮৩-৮৪

"তাই বলি," মাথা ঈষৎ দুলিয়ে বললেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

গুরুভক্তিই আসল, গুরুভক্তি ঈশ্বর ভক্তি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রামকৃষ্ণ আবার বলে চলেন, "সকলেই চায় গুরু হবে, শিষ্য হতে বড় কেউ চায় না, কিন্তু দেখ উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নীচু জমিতে, আল জমিতে জমে। গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি নিয়ে সাধন ভজন কর।"

তবে সাধনায় সরলতা, নিষ্ঠা ও প্রেম চাই। আড়ম্বর রহিত হতে হবে। সেই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, "জান তো যে শামুকের ভিতর মুক্তো হয় সেই শামুক স্বাতি নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়। যতদিন না মুক্তো হয়।" সকলে মূকস্তব্ধতায় কথাগুলি শুনছে।

রামকৃষ্ণ উঠোনের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর রাজেন্দ্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁগা, কেশব আসবে কখন? সে কি আসবে না?"

রাজেন্দ্র কেশবের অশৌচের কথা বললেন এবং জানালেন যে তিনি আসবেন।

অনেকজন ব্রাহ্মভক্ত এসেছেন। তাদের দেখে রামকৃষ্ণ বললেন, "ব্রাহ্মসভা না শোভা গো! তোমাদের সমাজে নিয়মিত প্রার্থনা হয়, বেশ ভাল। কিন্তু ডুব দিতে হয়। সচ্চিদানন্দ ভাবনা-সাগরে ডুব দাও, অনেক রত্ন আছে। রামপ্রসাদ তার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই গেয়েছিলেন 'ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' শুধু উপাসনা, লেকচারে কিছু হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে ভোগাশক্তি চলে গিয়ে তার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। এ যেমন ধর হাতির বাইরের দাঁত আর ভেতরের দাঁত।" উপমা সহ বোঝাচ্ছেন, "বাইরে শোভা আর ভেতরে গ্রহণ। বাইরের দাঁতে বাহার ভেতরের দাঁতে আহার। তেমনি ভেতরে কামিনী কাঞ্চনের ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়।" একটু চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে আবার বললেন, "বাইরে লেকচার ফেকচার দিলে কি হবে, শকুনি খুব উঁচুতে উঠতে পারে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে, হাউই হুস করে প্রথমে উপরে উঠে যায় আকাশে কিন্তু তার পরেই মাটিতে পড়ে যায়।"[১]

আগে ভেতরের ঘর পরিষ্কার করতে হবে, বাইরেটা আপনি আপনিই কখন হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, "এই সংসার ধোঁকার কুটি। ভোগাশক্তি যদি যায় তবে শরীর ত্যাগের সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়বে। তৃষ্ণা যদি থাকে তবে এই সংসারের জিনিসই সব মনে পড়বে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মান, সম্ভ্রম এই সব।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো এই কথাই বলেছেন যে মৃত্যুকালে যে যা মনে করে—তার তাদৃশ প্রাপ্তি হয়। অভ্যাস যোগের কথা বললেন রামকৃষ্ণ, "পাখী অভ্যাস করে 'রাধাকৃষ্ণ' বোল বোলে, বেড়াল ধরলে 'ক্যাঁ, ক্যাঁ' করে। তাই সর্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নাম গুণ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম) ২য় সংস্করণ পরিশিষ্ট

কীর্তন, তাঁর ধ্যান, চিন্তা, প্রার্থনা—যেন ভোগাশক্তি চলে যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।"

'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে',—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন। অভ্যাস থেকেই বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থেকে ভক্তি। অভ্যাসকে পাকাপোক্ত করা চাই। যারা এ ভাবে অভ্যস্ত হয় তাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়।

রামকৃষ্ণ আবার বললেন, "এমন যারা তারা সংসারে দাসীর মত থাকে। দাসী যেমন মনিব বাড়ি সব কাজ করে কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশে নিজের ঘরে। অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভক্ত ঈশ্বরের ওপর মন রেখে কর্ম করে। সংসার করতে গেলেই গায়ে পাঁক লাগবে। ঠিক ঠিক ভক্ত-সংসারী পাঁকাল মাছের মত, পাঁকে থেকেও গা পাঁক শূন্য।"

কি সহজ, সরল, সুন্দর উপমা রামকৃষ্ণের—একটুও জটিলতা নেই। সহজ পথই তো শুদ্ধির পথ।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। তাঁকে মা বলে ডাকলে শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়।"—এ কথা বলে গান ধরলেন রামকৃষ্ণ :—

"শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল
কলুষের কু-বাতাস খেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।"

তাঁকে ভক্তি করলে, ভালবাসলেই হবে ;—পবিত্র প্রেমের অমৃতধারায় কলুষ মুছে যাবে। ঈশ্বরে মন রেখে সংসার ধর্ম করলে আর কোন ভয় নেই।

ভাবপূর্ণ হৃদয়ে রামকৃষ্ণ আবার গেয়ে উঠলেন ;

"যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীমমণি
সে বেশ লুকালি কোথা করাল বদনি।"—

গান গাইতে গাইতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর নৃত্যরত হলেন। তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন ও গান গাইছেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলীও উঠে দাঁড়ালেন। মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে রামকৃষ্ণের। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন, কারও মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই—যেন এক এক চিত্র পুত্তলিকা।

একজন ডাক্তার নাম দু'কড়ি, এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ রামকৃষ্ণের চোখে আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেখলেন, বোধহয় সমাধি বুঝতে চাইছেন সমাধি কেমন বস্তু। হায়! কি মূর্খের মত আচরণ। বিজ্ঞান যেখানে তল পেল না সেখানে এ কেমন অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। তাঁর এরূপ ব্যবহারে অন্যরা দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, কেউ কেউ কটু মন্তব্যও করলেন।

সংকীর্তন ও নৃত্য সমাপ্ত হলে সকলে আসন গ্রহণ করলেন। তখন কেশবচন্দ্র কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে এসে পৌঁছুলেন। কেশবচন্দ্রের শরীরে অশৌচ পালনের চিহ্ন বিদ্যমান। রামকৃষ্ণকে দেখে মৃদু হেসে তিনি আসন গ্রহণ করলেন, রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের নমস্কাব করলেন—ওঁদের দেখে তিনি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

রাজেন্দ্র কেশবচন্দ্রকে বললেন, "মায়ের নাম নিয়ে এতক্ষণ চমৎকার আনন্দে সময় কাটালাম আমরা।"

"বেশ, বেশ, শুনে খুব আনন্দ হ'ল।"

রাজেন্দ্র তখন ত্রৈলোক্যের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি গান আরম্ভ করুন আবার।"

কেশবচন্দ্র হেসে বললেন, "যখন পরমহংস মশাই বসেছেন তখন কীর্তন কোনও মতে জমবে না।"

মৃদঙ্গের তালে তালে গান আরম্ভ হল। ত্রৈলোক্য ও ব্রাহ্মভক্তরা গাইতে লাগলেন—

"মন একবার হরিবল, হরিবল, হরিবল
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল"

রামকৃষ্ণও ওঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগলেন। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গীত-লহরী, "মন একবাব হরিবল, হরিবল, হরিবল।" গান শেষ হলে আহারের ব্যবস্থা করা হ'ল। দোতলায় রামকৃষ্ণের আহারের আয়োজন করা হয়েছে, কেশবচন্দ্র অন্যান্যদের সঙ্গে নীচের তলাতেই আহার করবেন তবে পৃথক পংক্তিতে, তাঁর অশৌচ। এখনও খাওয়ার ডাক পড়েনি। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ কথা বলছেন, "আজ বেশ করে ছবি তোলা দেখে এলুম রাধাবাজারে ফটোর দোকানে। দেখলুম যে শুধু কাচের ওপর ছবি থাকে না। কাচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয় তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বর কথা শুনে গেলে কিছু হয় না, আবার তক্ষুণি ভুল হয়ে যায়। যদি ভেতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। না হ'লে শোনে আর ভুলে যায়।"

অনুরাগ বিনা, ভক্তি বিনা তাই কিছু হয় না। ঈশ্বরানুরাগের কালি চাই। না হ'লে ঈশ্বরের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত হবে না।

ভাবগম্ভীর, সুমধুর রাগ রঞ্জিত সঙ্গীত সারা বাড়িতে সুরের মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে। সুরতরঙ্গ যেন হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হৃদয় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সকলে নবীন গায়কের লাবণ্যময় কান্তির দিকে চেয়ে সঙ্গীত সুধা পান করছে। গান গাইছেন সিমলার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্র নাথ।

রামকৃষ্ণ, রামদত্ত, মনোমোহন, বলরাম, রাজমোহন, কেদার, রাখাল, কান্তিবাবু প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। সিমলার ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক মহোৎসব। আসর বসেছে জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে।[১] এঁরা সকলে নিমন্ত্রিত অতিথি। নরেন্দ্রনাথ সিমলার ব্রাহ্মসমাজে প্রায়শঃই যাতায়াত করেন, সঙ্গীতে ও ধর্মালোচনায় অংশ নেন। কিছুদিন পূর্বে রাম দত্তের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণকে দেখে এসেছেন।

উদাত্ত গলার মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত সভাগৃহে গমগম করে বাজছে। রামকৃষ্ণ স্নিগ্ধ নয়নে নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে আছেন। চোখের পলক পড়ে না। সমাধিতে নরেন্দ্রকে দেখেছেন রামকৃষ্ণ। ঐ ছেলেটিকেও তাঁর বড় দরকার।

এরই মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে কেশবচন্দ্র এসে পৌছুলেন এবং রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রতি প্রণাম করে রামকৃষ্ণ কেশবের ডান হাতটি ধরে রেখে ক্ষণ পরে আবার ছেড়ে দিলেন। চারিদিকে মণ্ডলাকারে গৃহস্থভক্তরা বসে আছেন। সেদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে হাসিমুখে রামকৃষ্ণ বললেন, "তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, সংসারীর নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছে। কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।"[২]

"মন নিজের কাছে এলে" পুনর্যোজনা করে তিনি বললেন, "তখন সাধন ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, আর সাধু সঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তে নয় সাধুসঙ্গ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে পুনরায় বললেন, "মন একলা থাকলেই ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়।"

রুদ্ধবাক হয়ে গভীর একাগ্রতায় সকলে কথামৃত পান করছে। সংসারীকে সবল আশ্বাস দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ। অনেকেই ভাবছে তবে তো আমরাও ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারি।

আচার্য কেশবচন্দ্রেরও উপলব্ধি যে সংসারী হয়েই ভগবানকে লাভ করতে হবে— সপরিবারে সর্বকলুষ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মসাধন করতে হবে—

"সপরিবারে ধর্মসাধন হিন্দুস্থানের সর্বোচ্চভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া, পরিবার বিসর্জন দিয়া ধর্মসাধন করিতে হইবে। ধর্মসাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহা কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান

১ দিনটি ছিল রবিবার, ১লা জানুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম ভাগ), পরিশিষ্ট, পৃঃ ২২৩ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

করিতে পারে না, কিন্তু মানুষ যদি সংসারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্মসাধন করিতে পারে না, জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার স্মরণ হয়, সেখানেও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা হয়।

বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব শিখা যায় সেই দিকে চল, প্রাচীন আর্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্মিনী করিয়া যোগ পথে প্রবৃত্ত করিবার বিধান।... ... ...

যে দেশে জনক ঋষি জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে। যে স্থান ঋষিগণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান, সেই ব্রহ্মের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি।''[১]

এবার রামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন মনের শুষ্কতার বিষয়।—"একভার জল যদি আলাদা রেখে দাও ক্রমে তা শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভেতর যদি ঐ ভাড় ডুবিয়ে রাখ তাহলে শুকাবে না।''—

কথা শুনে কেশবের চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। মনকে সজীব সরস করতে হবে, তা না হলে রসময় ভগবানকে লাভ করা যাবে কি করে? ভক্তির রস ঢেলে মনকে মাখো মাখো করতে হবে। তার জন্য দরকার সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ মনকে ঈশ্বরস্থ করে। অবিরাম প্রস্রবণ ধারার মত রামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী।

—"কামার শালার লোহা আগুনে লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখ, যেমন কালো লোহা তেমনি কালো।''

একটু থেমে আবার বললেন, "তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়।"[২]

কথা শেষ হলে কেশবচন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বললেন, "কত সুন্দর ভাবে জীবনের এই সত্যকে বোঝা গেল।''

"একেবারে আমি যায় না," রামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন, "এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছে আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে সেই রকম কোথা থেকে আমি' এসে পড়ে।''

অহংকার মানুষের সহজাত,—তাকে নির্মূল করা যায় যায় না। তা হ'লে তো মানুষই নির্মূল হয়ে যাবে। তবে হাঁ, অহংকারকে মোড় ফেরান. যায়, তাকে ভূষণে ভূষিত করা যায়। যেমন; আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান—আমি নিষ্পাপ, শুদ্ধ, নির্মল এই রকম ভাব। তা কেমন করে সম্ভব সে কথাই বলছেন তিনি, "তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে 'আমি' রেখে দেন তাকে বলে 'পাকা আমি'। যেমন, তরবার, পরশমণি ছুঁয়েছে সোনা হয়ে গিয়েছে। তার দ্বারা আর হিংসার কাজ হয় না।"

ঈশ্বর-পরশে অহংকারকে তেমন সোনা করতে হবে।

ঠাকুর দালানের উপর বসে কথা হচ্ছে। রাত বেশ হয়েছে, আটটা বাজে, তবু কারও হুঁশ নেই। ব্রাহ্ম সমাজের, রাত্রিকালীন উপাসনার সময় হয়েছে, তা নির্দেশ করে তিনবার সঙ্কেত ঘণ্টা বাজল। ঘণ্টা ধ্বনি শুনে রামকৃষ্ণ বললেন, "আরে!

---

১ 'সপরিবারে ব্রহ্মসাধন'—আচার্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ ১১, ৫, ১৮৭৯

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম ভাগ) ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ২২৩

তোমাদের উপাসনা হবে না ?" কেশবচন্দ্র উত্তরে বললেন, "আর উপাসনা কি হবে ? এই তো সব হচ্ছে।"

"না গো, যেমন রীতি তেমন হোক।"

"কেন, এইত বেশ হচ্ছে ?"[১]

কেশবচন্দ্র উপাসনা করতে চাইছেন না, এই যে ঈশ্বর-কথা হচ্ছে এই তো উপাসনা। তা ছাড়া তিনি চান রামকৃষ্ণের কথা মানুষ যতটুকু শুনতে পায় পাক, এতে যে তাদের অশেষ কল্যাণ। এমন সহজ সুন্দর করে ঈশ্বরের কথা আর কে শোনাবে ?

রামকৃষ্ণ মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললেন, "না না একটু প্রার্থনা কর।" জগজ্জননীর কত কথাই তো ব'লা হল। এ কথার শেষ নেই। এবার মাকে ডাকা যাক।

ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা ব্রহ্মেরই আনন্দ-কণা। শুনতে শুনতে মনে হয় স্বয়ং ভগবান সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছেন। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। পাষাণ হৃদয়কে গলিয়ে দেয়, ভক্তকে আকুল করে কাঁদায়। কেশবচন্দ্র উপাসনা করছেন, সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছেন, রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর। উপাসনার মধ্যে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তারপরই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মুখে লেগে রয়েছে অমলিন স্বর্গীয় হাসি। উপাসনা শেষ হলে ব্রাহ্মভক্তরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইলেন,—

"হরিনাম আনন্দ-রসেতে কবে মন মজিবে।
অনুরাগে দুনয়নে প্রেমধারা বহিবে।
প্রেমেতে পাগল হয়ে, তোমারে হৃদয়ে লয়ে
প্রাণ আমার ভুলে থাকিবে।
ওরূপ-সুধা-সাগরে, ডুবিয়ে আনন্দ ভরে
প্রেমামৃত পান করে তাপিত প্রাণ জুড়াবে।"—

চারিদিকে গানের রেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে,—

"হরিনাম-আনন্দ-রসেতে কবে মন মজিবে।"

রামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কেশবচন্দ্রও ভাবে বিভোর, বেহুঁশ প্রায়। ভাবনয়নে একবার চাইলেন রামকৃষ্ণের দিকে তারপর অতি সন্তর্পণে তাঁর হাত ধরে দালান থেকে প্রাঙ্গণে নামলেন। তখনও গান হচ্ছে,—

"প্রেমেতে পাগল হয়ে, তোমারে হৃদয়ে লয়ে
প্রাণ আমার ভুলে থাকিবে।"—

কিছুপর রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙ্গল। সঙ্গীতের সঙ্গে তিনি নৃত্যে মগ্ন হলেন। মাথার উপর দু'হাত তুলে মনোহরণ ভঙ্গিমায় নৃত্য করছেন। এ যেন আর এক নব-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কেশবচন্দ্র মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখছেন আর ডগমগ আনন্দে সঙ্গীতের তালে তালে হাত তালি দিচ্ছেন। মরি মরি ! কি অপূর্ব দৃশ্য !

কিছু সময় অতিবাহিত হ'লে জ্ঞান চৌধুরী কেশবচন্দ্রের কানে কানে বললেন, "এবার আহারের ব্যবস্থা করছি, অনেক রাত হ'ল।"

কেশবচন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আহারের ব্যবস্থা হ'লে সকলে আহারে বসলেন এবং আহারান্তে নীচে নেমে রামকৃষ্ণের কাছে জড় হলেন। রামকৃষ্ণ অস্ফুটে

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম ভাগ), ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট ভাগ, পৃঃ ৮৭-৯০, আশ্বিন ১৩৪৪

দু'একটি কথা বলছেন। কথা কইতে কইতে হঠাৎ ভাবাপ্লুত হয়ে গান গেয়ে উঠলেন,—

"মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে।"

কেশবচন্দ্রও রামকৃষ্ণের সঙ্গে গান গাইতে লাগলেন। উভয়ে ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। দুজনায় মেতে গেলেন ;—

"শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল
কলুষের কুবাতাস খেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।"—

ক্রমে ক্রমে রাত বেড়ে চলে, কারও হুঁশ নেই। দুজনে ঈশ্বর-প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। এইভাবে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নৃত্য-গীত চলল। তারপর সবাই বিশ্রাম নিলেন। তখন রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে বললেন, "তোমার ছেলের বিয়ের বিদেয় পাঠিয়েছিলে কেন? ওসব আমি নিয়ে কি করব? ফেরত এনো।"[১]

কেশবচন্দ্র জানতেন দেখা হ'লে রামকৃষ্ণ এই কথাই তাঁকে বলবেন, তাই খুশী মনে হাসলেন রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে।

রামকৃষ্ণ আবার বললেন, "কাগজে আমার নাম ছাপাচ্ছ কেন গা? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে কাউকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না—লোক হল পোক। যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে।"

এ কথা কেশবচন্দ্রের চেয়ে আর কে ভাল জানে? মানুষের কাছ থেকে তিনি কম দুর্ব্যবহার পেয়েছেন? যে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মানুষের জন্য প্রাণ দিতে পারতেন সেই মানুষটাকে কত লোকে কত কি বলল, ঠকাল, অপমান করে ব্যথা দিল।

রামকৃষ্ণের কথা শুনে কেশবচন্দ্র হাসলেন, মনে মনে বললেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো আমায় করাচ্ছে, আমি ঘরে ঘরে তোমার কথা বলে বেড়াব।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন রামকৃষ্ণ, পরে আপন মনে ধীরে ধীরে বললেন, "আমি মান্য গণ্য হতে চাই না, যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকি।"—

কেশবচন্দ্র প্রীতিপূর্ণ নয়নে রামকৃষ্ণের মুখ-পানে চেয়ে রইলেন।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম ভাগ) ২য় সংস্করণ, পরিশিষ্ট ভাগ, পৃঃ ৮৭-৯০, আশ্বিন ১৩৪৪

প্রায় মাসাধিককাল পর কেশবচন্দ্র আবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন।[১] তিনি জাহাজ করে দক্ষিণেশ্বর ঘাটে এসে পৌঁছুলেন। তাঁর সঙ্গে আছেন বহু ব্রাহ্মভক্ত, তাছাড়া আরও দু'জন বিশিষ্ট অতিথি। অতিথিদের একজন হচ্ছেন আমেরিকান ধর্মযাজক Joshep Cook, অন্যজন ধর্মপরায়ণা ইংরাজ বিদুষী কুমারী Pigot.

কেশবচন্দ্র তাঁর একজন অনুগতকে রামকৃষ্ণের কাছে অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অনুগ্রহ করে জাহাজে আসেন, ওঁকে নিয়ে কেশব গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করবেন।

রামকৃষ্ণ এলেন ধীর পায়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তরা তাঁকে সযত্নে জাহাজে তুলে নিলেন। রামকৃষ্ণ আজ চুপচাপ রয়েছেন, বেশি কথা বললেন না, কেবল Cook সাহেবকে দেখিয়ে কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে ?"

অতিথি দু'জনারই পরিচয় দিলেন কেশবচন্দ্র, বললেন যে "এ'রা ঈশ্বরভক্ত, কলকাতায় এসেছেন।"

অতিথিদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে রামকৃষ্ণ বললেন "বেশ।"

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কথা Cook সাহেব ও কুমারী Pigot কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত বলেছেন, তাই তাঁরা মনে শ্রদ্ধা ও কৌতূহল নিয়ে রামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছেন। জাহাজে অন্যান্যদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তও রয়েছেন, উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনার পর কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সঙ্গে নানা ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি তাঁর 'নববিধান' সম্বন্ধে কিছু বললেন। রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের কথা আগ্রহভরে শুনলেন, তারপর বললেন, "ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে সকল ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকেই যাচ্ছেন। গন্তব্যস্থান এক শুধু পথ আলাদা।" কেশবচন্দ্র আলোচনার মাঝে বিনয়নম্র কণ্ঠে অভিমত প্রকাশ করলেন যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আছে ঐক্য, সকল ধর্মের একই গন্তব্য স্থান কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়ের গন্তব্য পথ এক।

কথা বলতে বলতে এক সময় রামকৃষ্ণ হঠাৎ ভাবসমাধি মগ্ন হলেন। ধর্মযাজক Cook ও কুমারী Pigot তাঁর ভাবসমাধি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন, গভীর বিস্ময় বোধ করলেন। রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থায় থাকাকালীন তাঁরা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনাও করলেন।

সেদিন বক্তৃতা সর্বস্ব ধর্মযাজককেরা এক বিস্ময়কর উপলব্ধি নিয়ে ফিরে গেলেন।[২]

এই ঘটনার পর আরও তিনমাস কেটে গেছে। রামকৃষ্ণ একদিন অস্থির হয়ে উঠলেন, "আমি কেশবকে দেখতে যাব।"

---

১ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ম), পৃঃ ১৩

লোকমুখে জানতে পেরেছেন কেশবচন্দ্রের গুরুতর অসুখ হয়েছিল। কারও কাছ থেকে এর আগে খবর পাননি। মনটাও কেশবচন্দ্রের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল তাঁর। অসুস্থতার জন্যই কেশব এতদিন আসেন নি।

"হাঁগা, কেশব কেমন আছে জান? বড় অসুখ হয়েছিল তাঁর?" মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে এলে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

"হাঁ, আমিও সেরকম শুনেছিলুম। তবে এখন ভাল আছেন।"

"জান, আমি কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, "মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও, ও না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব। তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম সিদ্ধেশ্বরীর কাছে।"[১]

কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আশ্চর্য ভালবাসা! মুগ্ধ হয়ে সেই কথাই ভাবছেন মাস্টার। পরমহংস রামকৃষ্ণ যিনি শুদ্ধাভক্তি ছাড়া জগন্মাতার কাছে কিছু চান না, সেই রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের অসুখ সারিয়ে দেবার জন্য ঈশ্বরীর কাছে ডাব চিনি মেনেছেন। কি গভীর ভালবাসা।

কেশবচন্দ্রের বাড়ি কমলকুটিরে যাবার আগে রামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাড়ি এলেন, সঙ্গে রাম, মনোমোহন সুরেন্দ্র এঁরাও আছেন। রামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাড়িতে কিছু সময় কাটিয়ে তবে কমল-কুটিরে যাবেন।

বিকেল পাঁচটায় রামকৃষ্ণকে নিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল কমল-কুটিরের দরজায়। চৈত্রমাসের অপরাহ্ণ, এখনও বেশ আলো আছে বাইরে।[২] কেশবচন্দ্র ভিতর বাড়িতে রয়েছেন। খবর পেয়ে তড়িৎ গতিতে ফটকে এসে তিনি রামকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের নমস্কার করলেন এবং সাদর অভ্যর্থনায় ওঁদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে চললেন। তিনি রামকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতি নমস্কার করে রামকৃষ্ণ অপলক নয়নে কেশবচন্দ্রকে দেখছেন। বেশ কৃশ হয়ে গেছেন ব্রহ্মানন্দ। রামকৃষ্ণের চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে, মুখে বেদনার ছায়া, কি ভাবছেন তা তিনিই জানেন। কেশবচন্দ্রের পরনে বাহিরে যাবার জামা কাপড় দেখে রামকৃষ্ণ শুধালেন ;—"কোথাও বেরুচ্ছিলে নাকি?"

"হাঁ, কালীনাথের অসুখ, ওকে দেখতে যাচ্ছিলাম। পরে যাব।"

অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে রামকৃষ্ণ এবার বললেন, "এখন তুমি তো ভাল আছ, কিন্তু তোমার অনেক কাজ, আবার কাগজে লিখতে হয়। তোমার সময় কোথায় যে সেখানে যাবে। আমিই দেখতে এলাম।"

শুধু কি অভিমান, কত নিবিড় আত্মীয়তাই না ফুটে উঠল রামকৃষ্ণের কণ্ঠে ;—

"কেশব, তোমার অসুখ শুনে ডাব চিনি মেনেছিলুম। মাকে বললুম, মা কেশবের যদি কিছু হয়, তা হলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব।"

সরল শিশুর মত জগজ্জননীর কাছে মনের আকুতি জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম), পৃঃ ১৮-১৯

২ দিনটি ছিল ২রা এপ্রিল, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

কেশবচন্দ্র কথা শুনে অভিভূত হলেন, গভীর আন্তরিকতার দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের দিকে চাইলেন। নিজেকে ধন্য মনে করছেন তিনি।

প্রতাপ মজুমদার, প্রসন্ন সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তরা মণ্ডলাকারে বসে আছেন। রামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ অদূরে উপবিষ্ট মাস্টার মহেন্দ্র-গুপ্তকে দেখে তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রতাপদের বললেন, "উনি কেন দক্ষিণেশ্বর যান না জিজ্ঞেস করতো ; অথচ বলেন মাগ ছেলের উপর মন নেই।"

মহেন্দ্রনাথ সম্প্রতি রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, মাত্র মাসখানেক হ'ল দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করছেন, প্রেমময় রামকৃষ্ণ এর মধ্যেই তাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন। দক্ষিণেশ্বর যেতে পারেন নি বেশ কিছুদিন হ'ল। তাই রামকৃষ্ণ অভিমান জানাচ্ছেন। মাস্টার অভিভূত হয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণ ওঁকে বলেছিলেন যে দক্ষিণেশ্বর যেতে দেরি হ'লে তিনি যেন একটা চিঠি লেখেন। দেরিতো হয়েছেই, পত্রও দেওয়া হয়নি। এ কথা মনে করে মহেন্দ্রনাথ লজ্জা পেলেন।

আজ আসরে পণ্ডিত সমাধ্যায়ী উপস্থিত আছেন। পণ্ডিত মানুষ, বেদ বেদান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য। ভক্তরা রামকৃষ্ণের সাথে সমাধ্যায়ীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। রামকৃষ্ণ সমাধ্যায়ীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "এ'র চোখ দিয়ে এ'র ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি যেমন সার্সি-দরজার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যকার জিনিস সব দেখা যায়।"

কথা শুনে সমাধ্যায়ী বিনয় সহকারে মাথা নত করলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তারপর ত্রৈলোক্যনাথ একটা গান গাইলেন, তাঁর স্বরচনা। সঙ্গীত শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ ভাবাপ্লুত হলেন। সন্ধ্যা হয়েছে, ঘরে বাতি জ্বেলে দেওয়া হ'ল। গানের প্রবাহ চলতে লাগল, আনন্দ মনে সকলে গান গাইছেন। রামকৃষ্ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কালী মাতার নাম করতে লাগলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্য-জ্ঞান হারা হয়ে তাঁর ভাব-সমাধি ঘটল। তবে কিছুক্ষণ পরই পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়ে গান ধরলেন, তখন ত্রৈলোক্য গান থামিয়েছেন। রামকৃষ্ণ গাইলেন,

"সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতাল মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান-শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটি পান করে মোর মন-মাতালে ॥
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা
প্রসাদ বলে এমন সুধা খেলে চতুর্বর্গ মেলে ॥"

গান থামিয়ে তিনি মুগ্ধ কেশবচন্দ্রের দিকে প্রীতিপূর্ণ নয়নে চাইলেন, যেন কত আপনার জন—আত্মার আত্মীয়। আবার মনে ভয় যদি সে সংসারের হয়ে যায়। রামকৃষ্ণের কত আক্ষেপ ; কতবারই তো বলেছেন,

"কেশব যদি সংসারী না হ'ত তাহলে ও আরও কত কাজ করতে পারত।"

রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দিকে অনুরাগের দৃষ্টিতে চেয়ে আবার গান ধরলেন ;—

"কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই,
মনের সন্দ হয়, পাছে তোমা হেন ধনে হারাই হারাই ॥

আমরা জানি যে মন্তোর,
দিলাম তোরে সেই মন্তোর,
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই ॥"

কেশবচন্দ্রকেই গান গেয়ে যেন বলছেন,—

"আমি জানি যে মন্তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তোর, এখন মন তোর।"

অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক, সে মন্ত্রের কথাই তোমাকে বলছি, সে মন্ত্রই তোমাকে দিতে চাইছি। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। তাঁকে না পেলে কিন্তু কিছুই হ'ল না। এই হ'ল মহামন্ত্র।

রামকৃষ্ণ এবার আসনে উপবেশন করলেন। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। কেশবচন্দ্র ভাবের ঘোরে বেহুঁশ প্রায়, কিছুক্ষণ, পর তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন।

অন্দর মহলে জলযোগের আয়োজন হচ্ছে। তার যোগাড় কেমন হ'ল তা দেখতে কেশব ভিতরে গেলেন। হ'ল ঘরের এককোণে পিয়ানো রাখা আছে। একজন ব্রাহ্মভক্ত আপন মনে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন, খানিক দেখলেন, হাসলেন আপন মনে।

কেশবচন্দ্র বাড়ির ভিতর থেকে ফিরে এলেন এবং যত্নের সঙ্গে রামকৃষ্ণকে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। পুর মহিলারা রামকৃষ্ণকে প্রণাম জানালেন। কেশবজননী সারদাসুন্দরীকে রামকৃষ্ণ বললেন, "মা, কেমন আছ ?"

—"ভাল আছি বাবা। আপনি আশীর্বাদ করুন।"

"সে কি মা, আমি কি করে আশীর্বাদ করব।" কিছু উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বললেন। তারপর মধুর হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বললেন, "তোমার কি ভাবনা মা ; সবই তো হয়ে গেছে তোমার। তুমি দেবী, সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ।"

রামকৃষ্ণের কথায় লজ্জা পেলেন সারদাসুন্দরী। পরিপাটি করে আহার সাজিয়ে বললেন, "নিন বাবা বসুন।" তার হাতে হাতপাখা। কেশবচন্দ্র সযত্নে রামকৃষ্ণকে আসনে বসিয়ে দিলেন।

আহারের পর্যাপ্ত আয়োজন করেছেন কেশব-জননী। চচ্চড়ি, শুকতো যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে রামকৃষ্ণের প্রিয় বরফ দেওয়া জল আর মচ্‌মচে জিলিপি। জিলিপি খেতে রামকৃষ্ণ খুব ভালবাসেন। কেশবের বাড়ি এলেই তাঁর জিলিপি চাই।

রামকৃষ্ণ যৎসামান্য আহার করলেন। কেশব তাঁর মুখ-হাত ধুয়ে পুছিয়ে দিলেন।

মধুর হাসিতে ও অমৃত কথায় রামকৃষ্ণ আরও কিছুক্ষণ সকলকে আনন্দ দিলেন। তারপর গাড়ী ডাকা হ'ল। সবাইকে আর একবার নমস্কার করে রামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠলেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলল।

কেশবচন্দ্রের বাড়িতে নব-বৃন্দাবন নাটকের অভিনয় হবে।[1] নাটক রচনা করেছেন ত্রৈলোক্য সান্যাল—পরিকল্পনা তাঁদের উভয়েরই। নাটকাদি করার ব্যাপারে কেশবচন্দ্র কিশোর কাল থেকেই উৎসাহী। নাটক দেখতে রামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করেছেন কেশব, তার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের আরও কয়েকজনকে।

কেশবচন্দ্রের অভিনয় করার খুব সখ। উত্তম নাটক অভিনয়ে চরিত্রের উপর নৈতিক প্রভাব কিশোর কাল থেকে তিনি মেনে আসছেন। এখন উচ্চ অধ্যাত্ম জীবনের অনুরূপ করে ত্রৈলোক্যের সহায়তায় তিনি নব-বৃন্দাবন নাটকটির সৃষ্টি করলেন। ভাদ্রোৎসবের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান রূপে নাট্যাভিনয় হবে এই রকমই স্থির হয়েছে।

কেশবচন্দ্রের অভিনয়েও দক্ষতা আছে। অতীতে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কিছু নাটকে অংশ নিয়েছিলেন, জনচিত্তও তাতে মোহিত হয়েছে। "নব-বৃন্দাবন" নাট্যাভিনয় ব্যাপারে কেশবচন্দ্র লিখলেন ;—

"নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চর্য আশ্চর্য অভিনয় সর্বদা হচ্ছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার বহন করতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাজিয়েছ তা তার হতেই হবে। যে যেখানে থাকে, তার নির্দিষ্ট কার্য অভিনয় করতেই হবে। মা, এ তো তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অদৃষ্টে ছিল, তারা একসঙ্গে এসে দাঁড়াবে, যেমন দাঁড়াবে ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠবে। নাটক অভিনয়ে পাপীর উদ্ধারের সহজ উপায় হবে, সকল ধর্মের সমন্বয় হবে, দুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এতদিন একটি দলকে বুকের ভেতর রেখেছিলে, যাই ঊনবিংশ শতাব্দী এল, উপযুক্ত সময় এল, তুমি নিদ্রিত দলকে উত্থিত করলে, তারা একটি ঘরে এল। বিধান নাটকের অভিনয় করবে। মা, এই নব-বিধানের অভিনয় করে রেখে আমরা যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্যে ব্রতী হই। হে মুক্তিদায়িনী, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব ব্যাপার। কাকে রাজা সাজাও, কাকে গরীব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতেদড়ি বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান : আমি জানি এই যে রোজ একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্ছে। মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে নাচব, তুমি যা সাজাবে সাজব, তুমি যা বলাবে বলব। আমি যে তোমাকে ভালবাসব, আমি যে তোমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলবে করব। মা, পুণ্য ভূমি প্রস্তুত হচ্ছে যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হচ্ছে। নাটকে যে পরিত্রাণ হবে মা! এ যে বিশ্ব নাট্যশালা, এ যে ধ্রুবলোক। মা আপনি দাঁড়ায়ে থেকে সমুদয়

১ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। নব বৃন্দাবন নাটকের রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-উপাচার্য। রামকৃষ্ণ তাঁকে ভালবাসতেন। স্বরচিত অনেক গান গেয়ে তিনি রামকৃষ্ণকে শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন।

করছেন। মা, তামাসা দেখবার জন্য, আমোদ করবার জন্য যারা আসছে তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা না হবে, এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বলছ 'তোদের যা সাজতে বলি তাই সাজিস; আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায়তা লয়ে নাট্যশালায় প্রবেশ করিস। তা হ'লে আবার নব-দ্বীপ টলিবে, সকল পাপী অবিনাশের মত স্বর্গে যাবে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সব এক হবে।"

* * * হে করুণাময়ি, হে জননি, তুমি কৃপা করে এমন আশীর্বাদ কর, যদি অদৃষ্ট ক্রমে তোমার নাট্যশালায় এসেছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করে আপনারা তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করে শুদ্ধ ও সুখী হই।"[১]

দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা নাটক দেখতে এলেন কমল-কুটিরে। বিকেল বেলা। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য কমল-কুটিরের বাইরে লোক অপেক্ষা করছিল। সযত্নে ভিতরে নিয়ে গেল। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আগে রামকৃষ্ণ সদর দরজায় ভক্তি সহকারে শির স্পর্শ করলেন। আরও অনেক সময় তাঁকে এরূপ করতে দেখা গেছে। অনেক ব্রাহ্ম এখন রামকৃষ্ণকে ঘিরে আছেন।

"আচ্ছা, কেন অমন করলেন জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।" একজন রামকৃষ্ণকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি কেশবের জননীকে প্রণাম করলাম", রামকৃষ্ণ বললেন, "শ্রীভগবান যখন নৃসিংহ বেশে হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদর্ণ করেন তখন তিনি তার ছিন্ন শিরা প্রভৃতি দিয়ে নিজের দেহ বেষ্টন করেছিলেন। এই শরীরাংশই প্রহ্লাদের জন্ম তাই সে শরীরের এমন মাহাত্ম্য। কেশবকে দেখার পূর্বে তাই আধার স্বরূপিনী তার জননীকে প্রণাম করছি।"[২]

রামকৃষ্ণকে ঘরে এনে সযত্নে বসান হ'ল। কেশব উৎফুল্ল হয়ে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁর চোখে মুখে তৃপ্তি। রামকৃষ্ণও সকলকে প্রতি-নমস্কার জানালেন—মানুষের অন্তরে যে ঈশ্বর বিরাজমান তা'কে প্রণতি।

সবাই ওঁকে ঘিরে আছে, চিকের আড়ালে ওপাশে মহিলারা রয়েছেন।

কেশবচন্দ্রের দিকে অনুরাগের দৃষ্টি মেলে রামকৃষ্ণ বললেন, "থ্যাটার কখন হবে গো?"

কেশব বিনীত উত্তর দেন, "এই একটু পরেই আরম্ভ করছি।"

"তা কে কে আছ? তুমি, ত্রৈলোক্য—আচ্ছা নরেন্দ্রও আছে না?"[৩]

"হাঁ, নরেন ঋত্বিকের অভিনয় করবে।"

"বেশ, বেশ, অভিনয়ে লোক শিক্ষা হয়। তবে মিথ্যে অভিনয় ভাল নয়। এমন কি যারা সৎ অভিনয়েও তাদের মিথ্যে কথা বা কাজ ভাল নয়।"—

কেশবচন্দ্র বললেন, "আমরা সবাই মায়ের ইচ্ছায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে কেবল অভিনয় করে চলেছি।"

২ দৈনিক প্রার্থনা (১. ৯. ১৮৮২), কমল কুটির।

২ মাসিক বসুমতী, ৬ই ফাল্গুন ১৩৪০ সাল।

৩ নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ 'নব বৃন্দাবন' নাটকে অভিনয় করেছিলেন।

"বেশ কথা বললে তো! তা কেশব তুমি কি সাজছ ?"

কেশবচন্দ্র বিনয় নম্র কণ্ঠে জানান, "সাধু পাওহারী বাবার পার্ট।"

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ, আর তাই এত ভালবাসা। এই অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত অনেক আগেই হয়েছে, যখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয়ই ছিল না। তখনই কেশবের আত্ম-পরিচয় পেয়েছেন রামকৃষ্ণ, আর তখনই কেশবচন্দ্র তাঁর আত্মীয় হয়েছেন। সে ঘটনার কথা রামকৃষ্ণ নিজমুখেই বলেছেন—

"ঘরে বসে আছি, দরজা বন্ধ। হঠাৎ দেখলুম এক জ্যোতির্ময় আলোর ছটা গোটা ঘর উজ্জল করে প্রবেশ করল, দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান হ'ল; প্রত্যক্ষ হ'ল অণু-পরমাণু। এক সুন্দর বেদী যেন তৈরী হ'ল আর তারপর সেই জ্যোতির্ময় আলো ক্রমে ঘনিভূত হয়ে সেই বেদীর উপর কেশবের রূপ নিল। তা দেখে আমার ভাব হ'ল আর দেখলুম আমার অঙ্গ হতে এক দীপ্ত আলোক শিখা পলকের মধ্যে বেরিয়ে কেশবের শরীরে মিলিয়ে গেল।"[১]

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র তাই আত্মায় আত্মায় আত্মীয়। কি প্রগাঢ় প্রেম! ভালবাসায় ব্যাকুল হয়ে তিনি কেশবকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলেছেন, "ও গো, তুমি শ্যাম,, আমি রাধা।" রামকৃষ্ণ তাই কেশবচন্দ্রকে অধিক দিন না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন. কেশবচন্দ্রও রামকৃষ্ণকে বেশি দিন না দেখে থাকতে পারেন না। এ ভালবাসার তুলনা নেই।

নাটকের আসরে কেশবচন্দ্রের এক মো-সাহেব সকলের মধ্যে তার তোষামোদ করল। তাঁকে শ্রীচৈতন্যের অবতার বলে উল্লেখ করল। রামকৃষ্ণ শুনে মিটিমিটি হাসছেন। কেশব এ কথায় বেশ বিরক্ত হয়েছেন তাঁর মুখ দেখে মনে হল। এর আগে একবার নিমাই সন্ন্যাস পালা দেখতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। তখন একজন কেশব-ভক্ত বলেছিল, "এবার চৈতন্য কেশব রূপে আর নিত্যানন্দ প্রতাপরূপে এসেছেন। এ'রা দুজনে গৌর নিতাই।"—

এরূপ অসার কথায় কেশবচন্দ্র সেদিন খুবই বিব্রত ও বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রসন্ন সেন রামকৃষ্ণকে এ কথার উপর বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তা হলে আপনি কি ?"

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের দিকে হাসি মুখে চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ কি বলেন সে সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "আমি তোমাদের দাসানুদাস, রেণুর রেণু।"

তোমরা ঈশ্বর-ভক্ত তাই আমি তোমাদের সেবক। কেশবচন্দ্র মুচকি হেসে বলেছিলেন, "ইনি সহজে ধরা দেবেন না।"

ধরা না দিন রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশব তাঁকে ঠিকই চিনেছেন। মুখে 'অবতার' বলে হৈ চৈ করেন নি, তাই বা নয় কেন, দু'একবার তো কেশব নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন যে রামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য। তিনি মনে ঠিক জেনেছেন কে রামকৃষ্ণ। শুধু নিজেই জানেন নি, অন্যকেও তাঁর উপলব্ধি জানিয়েছেন। "উনি জন দি ব্যাপটিস্ট" তিনি রামকৃষ্ণকে উল্লেখ করে একথাও দু'একবার বলেছেন।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—শ্রী অক্ষয় সেন।

কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে আসনে বসিয়ে নাটকের তত্ত্বাবধানে গেলেন।

নব-বৃন্দাবন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হ'ল। অভিনয় উপভোগ করতে করতে অনেকবার ভাব-সমাধি মগ্ন হ'লেন রামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথের ঋত্বিকের পার্ট বড় সাবলীল হচ্ছে—অনেকে তারিফ করছেন। ত্রৈলোক্যের গানগুলিও রসে ও ভাবে পূর্ণ—চমৎকার। কেশবচন্দ্র করছেন সাধু পাওহারী বাবার পার্ট।[১]

একসময় অভিনয় দেখতে দেখতে রামকৃষ্ণ সামান্য বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা ঘটল এক ডেপুটিকে নিয়ে, ভদ্রলোকও এসেছেন নাটক দেখতে সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলে। ডেপুটি মশাই তাঁর ছেলেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কোথায় ছেলে বসবে, সে কি খাবে তাই নিয়ে হৈ চৈ করছেন, ছেলের সঙ্গে খালি বকর বকর—নাটক দেখতে এসেছেন অথচ নাটক দেখায় মন নেই। রামকৃষ্ণকে সবাই বলল যে উনি একজন মস্ত বড় ডেপুটি, সাত-আটশ টাকা মাস মাহিনা, দারুন পণ্ডিত। হঁ্যা, পাণ্ডিত্য বই পড়ে। রামকৃষ্ণ বিরক্ত হ'ন ডেপুটি মশাই এর ব্যাপার দেখে। কোথায় ঈশ্বরকথা হচ্ছে তা শুনবে, না ছেলের সঙ্গে বকর বকর করছে। কোন ধারণা শক্তি-নেই!

যাই হোক নাটক দেখে অতীব তৃপ্ত পেলেন রামকৃষ্ণ। নাটক শেষে পুরমহিলারা তাঁকে প্রণাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কেশবচন্দ্র তাঁকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। জননী সারদাসুন্দরী ও অন্যান্য পুর মহিলারা সেখানে রয়েছেন। তাঁরা ভক্তি সহকারে রামকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন, তিনি প্রতি-প্রণাম করে বললেন, "মা গো, তোমাদের ঈশ্বরে ভক্তি হোক।"

তাঁর আহারের ব্যবস্থা হয়েছে ঘরে। কেশবচন্দ্র তাঁকে আসনে বসিয়ে দিলেন। সারদাসুন্দরী নিজ হাতে পরিবেশন করছেন।

কেশবচন্দ্রের বাড়ী এলে রামকৃষ্ণের জন্য জিলিপি আনা হয়। তিনি জিলিপি খেতে খুব ভালবাসেন। এই জিলিপি খাওয়ার একটা গল্প আছে ঃ—

একবার রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নানা ধরণের কথা বাড়ির সকলে শুনলেন সেদিন। এরপর রামকৃষ্ণের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হ'ল। তাঁর বোধ হয় সেদিন পেট ভরা ছিল, যৎ সামান্য আহার করলেন। তাতে সারদাসুন্দরী দেবী দুঃখ প্রকাশ করলে রামকৃষ্ণ বললেন, "বেশ পেটে তো জায়গা নেই, তবে খান দুই জিলিপি খাওয়া যেতে পারে।"

১ নাটকের একস্থানে কেশবচন্দ্রের অভিনয় ছিল সাধুর বেশে শান্তি-জল সিঞ্চন করা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), (৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫) গ্রন্থে দেখা যায় যে এই দৃশ্য নাকি রামকৃষ্ণের ভাল লাগে নি। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ কথা তিনি অন্যান্যদের নাকি বলেছিলেন। রামকৃষ্ণের এ মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যায় না। তবে মনে হয় যেহেতু সাধু সন্তের 'সিদ্ধাই' অর্থাৎ রোগ আরোগ্য করা, ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা, পাপ দূর করানোর জন্য মন্ত্র তন্ত্র আওড়ান, শান্তিবারি প্রদান, তাগা-তাবিজ দেওয়া তিনি অপছন্দ করতেন তাই নাটকের এ দৃশ্য তাঁর হয়ত ভাল লাগেনি।

তক্ষুনি জিলিপি এল। আনন্দের সঙ্গে জিলিপি খেতে খেতে রামকৃষ্ণ মধুর হাসি হেসে বললেন, "যেমন বিস্তর ভীড় হয়েছে, লোক যাবার পথ নেই, তবে যদি শোনা যায় রাজার পেয়াদা এসেছে তো অমনি যো সো করে সরে বসে সবাই পথ করে দেয়; তেমনি পেট যত ভরাই থাকে এই জিলিপি হ'ল রাজার পেয়াদা. পেটে গেলে ঠিক পথ হয়ে যাবে।"

তাই কেশবচন্দ্রের বাড়ি এলে কেশব-জননী তাঁকে জিলিপি খাওয়াবেনই, ওঁকে খাইয়ে যে তাঁর পরম তৃপ্তি।

আহার শেষে দক্ষিণেশ্বর ফেরার সময় রামকৃষ্ণ স্মিতমুখে সারদাসুন্দরীকে বললেন, "দেখ মা, তোমার যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোক এরপর নাচবে। তোমার ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

বলাবাহুল্য কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্য করেই একথা বললেন তিনি। কেশব লজ্জিত হলেন।

রাত বেশ হ'ল. রামকৃষ্ণ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরলেন, ভক্তরা সঙ্গে রয়েছে। সারদাসুন্দরী তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। কেশব চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

## ২৩

শরৎ কালের বিকালবেলা, অপরাহ্ন-সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় ধরণী বড় মনোরম। আজ কোজাগর পূর্ণিমা।[১] বিজয় গোস্বামী, হরলাল এ'রা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন রামকৃষ্ণ দর্শনে। ওঁকে ঘিরে ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে। ঈশ্বর-আলোচনায় সবাই তদগত, ঘরের মধ্যে আনন্দের লহরী খেলছে। এমন সময় একজন ভক্ত এসে জানাল, যে ব্রহ্মানন্দ কেশব জাহাজ নিয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর তার কথা শেষ হতে না হতেই দু'জন ব্রাহ্মভক্ত এসে পেঁাছুলেন। নমস্কার করে তাঁরা বিনীত ভাবে বললেন, "আচার্য কেশব জাহাজ নিয়ে ঘাটে অপেক্ষা করছেন, তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে, অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন আপনি যেন আসেন। জাহাজে করে গঙ্গা বক্ষে একটু বেড়িয়ে আসবেন চলুন।"

—"কেশব এসেছে, আমায় ডাকছে, ও বিজয়, চল, চল, কেশব এসেছে।" উৎফুল্ল হয়ে রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বিজয় গোস্বামী তাঁকে ধরলেন, অন্যরাও উঠে দাঁড়ালেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সকলে ঘাটের দিকে চললেন। তাঁর মনের মানুষ তাঁকে ডাকছে, বন্ধুর সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন তিনি!

বিজয়ের মনে দ্বিধা, যদিও রামকৃষ্ণের টানে চলেছেন কিন্তু জাহাজে যেতে তাঁর ইচ্ছা নেই, সম্প্রতি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আদর্শের সংঘাতে মনোমালিন্য হয়েছে তাঁর, তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে সরে এসেছেন।

জাহাজ মাঝ দরিয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে এসে সকলে নৌকায় চড়লেন। নৌকাতে উঠেই রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে সমাধি মগ্ন হলেন। অদূরে জাহাজের 'পরে দাঁড়িয়ে আছেন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত।[২] মহেন্দ্র শিক্ষক, ভাবুক এবং লেখার চর্চাও তাঁর আছে। তাঁর খুব ইচ্ছে রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের অপূর্ব মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবেন। দুই বিপরীত ধারার মানুষ দুজনে অথচ উভয়ের মধ্যে কি গভীর প্রেম-বন্ধন এটাই মহেন্দ্রর আশ্চর্য লাগে। কেবল তাঁর কেন আশ্চর্য লাগে অনেকেরই। তাঁরা কেমন করে বুঝবেন। বাইরেটা যেমনই হোক ভিতরে ভিতরে একই অহৈতুকী ভক্তির রসে দুজনাই যে রসাপ্লুত।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির গঙ্গাবক্ষ থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। কেশবচন্দ্র ও আরও অনেকে জাহাজ থেকে সেদিকে চেয়ে আছেন। কেশব দেখলেন রামকৃষ্ণ নৌকায় উঠেছেন এবং তিনি সমাধিস্থ। পূর্বদিকে বাঁধাঘাট ও মন্দির বাড়ির চাঁদনী। চাঁদনীর উত্তর দিকে দ্বাদশ শিব-দেউল, তার মধ্যে ছ'টি দেখা যাচ্ছে। ভবতারিণী মন্দিরের চূড়াটি অপরাহ্নের স্নিগ্ধ আলোয় বড় মনোরম দেখায়। উত্তর দিকে পঞ্চবটী, তার কিনারে কিনারে সারিবদ্ধ ঝাউগাছের মাথাগুলি বাতাসের মৃদু দোলায় দোদুল্যমান।

১ ২১ অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পুস্তকের প্রণেতা শ্রীম

মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম ছবি। দুই নহবৎখানার মধ্যবর্তী উদ্যান পথের পাশে সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী গঙ্গাবক্ষ হ'তে অপূর্ব দেখায়। মুগ্ধ হয়ে কেশবচন্দ্র এসব দেখছেন।

শরতের স্নিগ্ধ নীলাকাশ। তার বুকে শাদা মেঘের ভেলা। সুনীল-শুভ্র মহাকাশের ছায়া পড়েছে নীচে ভাগীরথী সলিলে। গোধুলীর আলো কোমল ও স্নিগ্ধ। হৃদয়ে গভীর কোমল ভাবের সৃষ্টি করে। মাথার উপর অনন্ত বিশালতা, সম্মুখে মুক্তিতীর্থ দক্ষিণেশ্বর তার দক্ষিণেশ্বরীর দাক্ষিণ্য, নীচে পুতঃ সলিলা ভাগরথী তার বুকে নৌকায় আসছেন এক পুণ্যময় মহাপুরুষ। কেশবচন্দ্র ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে নয়ন মুদ্রিত করে তাঁর পরমব্রহ্মের স্মরণ করলেন।

নৌকা ধীর গতিতে এসে জাহাজে লাগলো। রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—তাঁকে নিরাপদে জাহাজে উঠাতে কেশবচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ভীড় হয়েছে বেশ, হাতের ইঙ্গিতে লোকজনদের তিনি সরে যেতে বললেন। তারপর অনেক কষ্টে রামকৃষ্ণের হুশ ফিরিয়ে তাঁকে কেবিন ঘরে নিয়ে আসা হ'ল। একজন ভক্তের কাঁধে ভর রেখে তিনি ধীরে ধীরে এলেন। এখন তেমন সাড় নেই, কেবল পা দুটি চলছে।

জাহাজের কেবিন ঘরটি ক্ষুদ্রায়তন। ঘরের মধ্যে একটি ছোট টেবিল ও কিছু চেয়ার রয়েছে। রামকৃষ্ণকে একটি চেয়ারে বসান হল। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্যরা তাঁকে প্রণাম করালেন। রামকৃষ্ণ অনড়, বেহুঁশ। কেশবচন্দ্র বিজয় গোস্বামীকে একটি চেয়ারে বসালেন এবং নিজে অন্য একখানিতে উপবেশন করলেন। অনেকের আবার ঘরে স্থান হল না তাঁরা কেবিন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন।

কেবিন ঘরে অনেক জনসমাগম। রামকৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে। কেশবচন্দ্র এদিক ওদিক চাইলেন। তাঁর সম্মুখেই বসে আছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এককালের বন্ধু ও অনুগতজন। বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেছেন, শুধু ত্যাগ নয়, তাঁকে ছেড়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েছেন ও তাঁর কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে বহু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন। তাই একটু অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে দু'জনকেই।

কেশবচন্দ্র উঠে গিয়ে ঘরের জানালা খুলে দিলেন—মুক্তবায়ু গৃহে প্রবেশ করল। সকলে স্থির নেত্রে নিবাত নিষ্কম্প রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরল। তবে ঘোর রয়েছে। অস্ফুটে আপন মনে বললেন, "মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের রক্ষা করতে পারব বেড়ার মধ্যে থেকে? এরা যে তোকে মানে না।"—

সংসারী মানুষ নানা বন্ধনে বদ্ধ। বিষয় কর্মে হাত পা তাদের বাঁধা। কামিনী-কাঞ্চনে তারা মোহগ্রস্থ। তারা ওই বেড়াজাল থেকে বাইরে আসতে পারছে না। শুধু বদ্ধঘরের জিনিষগুলো দেখতে পাচ্ছে, তারা ভাবছে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝি শুধুমাত্র আহার, নিদ্রা আর সৃষ্টি। কামিনী আর কাঞ্চন। সেজন্যই কি রামকৃষ্ণের কণ্ঠ হ'তে এ আকুতি,—"আমি কি এদের রক্ষা করতে পারব বেড়ার মধ্যে থেকে।" অথবা তিনি ব্রাহ্মদের নিরাকার ভাবনার গভীর কথা বলছেন। ব্রাহ্মরা কালী মানে না।

এবার রামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি হাসি মুখে সকলের প্রতি দৃকপাত করছেন। গাজিপুরে পাওহারী বাবা একজন সাচ্চা সাধু। তাঁর বিষয় আলোচনা হচ্ছে। নীলমাধববাবু গাজীপুরে থাকেন, তিনি সম্প্রতি পাওহারী বাবাকে

দর্শন করে এসেছেন, তাঁর মুখ থেকেই সকলে সাধুবাবার কথা শুনেছে। একজন ব্রাহ্মভক্ত রামকৃষ্ণকে বললেন, "এ'রা সব পাওহারী বাবাকে দেখে এসেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন, আপনার মতই একজন ঈশ্বর-প্রেমিক।"

কথা শুনে রামকৃষ্ণ মৃদু মধুর হাসি হাসলেন। ভক্তটি আবার বলেন, "পাওহারী বাবা তাঁর ঘরে আপনার ছবি রেখেছেন।"

"এই খোলটাকে রেখেছে," নিজের বুকে আঙ্গুল রেখে রামকৃষ্ণ বললেন, "এই দেহ, এটাতো একটা বালিশের খোল গো। বালিশ আর তার খোল। দেহী আর দেহ।" দেহের ভিতর যিনি আছেন সেই আত্মা অবিনশ্বর—নিত্য। দেহ নশ্বর—অনিত্য। তাই দেহের আদর করে তার ফটো নিয়ে লাভ কি?

"ভগবান মানুষের হৃদয়-পদ্মে, তাঁরই পূজা কর," রামকৃষ্ণ বলে চলেছেন, "তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বাস। তিনি সর্বভূতে স্থিত বটে তবে বিশেষরূপে ভক্তের হৃদয়-পদ্মে।" উপমা দিয়ে আরও প্রাঞ্জল করে বললেন, "যেমন কোন জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানেই থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি ত'ার অমুক বৈঠক খানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে জানে বা বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠক খানা।"

আহা! কি সুন্দর উপমার আভরণে অলঙ্কৃত অমৃতবাণী! আনন্দে অভিভূত সবাই।

কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠক খানা।"

রামকৃষ্ণের ভাব-উদ্দীপন হয়েছে, থামতে আর পারছেন না, অনর্গল বলে চলেছেন—

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে আর ভক্তেরা ত'াকেই ভগবান বলে। একই ব্রাহ্মণে যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে চলেছে সে 'নেতি, নেতি,' নেই নেই এই বিচার করে। কি বিচার? না, ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। এই ভাবের বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন লাভ হয় ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। তিনি যে ব্যক্তি মাত্র তাও বুলবার উপায় নেই।

"এক ঈশ্বর ত'ার ভিন্ন ভিন্ন নাম। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন পথিক—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত।"

কেশবচন্দ্র নীরবে রামকৃষ্ণের কথা শুনছিলেন, স্মিত মুখে বললেন, "কত গূঢ় ভাবের কথা, কতই না সহজ সুন্দর করে বোঝান হল।"

রামকৃষ্ণ আরও বললেন, "বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ভক্তদের কাছে কিন্তু জাগ্রত অবস্থাও সত্য। তারা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, তার বুকে এই নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, পর্বত, জলধি, জীব, এসবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই স্থাবর জঙ্গম তাঁরই ঐশ্বর্য। আর পরমব্রহ্ম মানুষের অন্তরস্বামী—অন্তরে বিরাজিত। আবার বাইরেও রয়েছেন। ভেতরে বাইরে ওতঃপ্রোত।"

ক্ষণ বিরতির পর আবার বললেন, "ভক্তের ভাব কেমন জান? সে সর্বস্ব দিতে চায় ভগবানকে। বলে তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান। তুমি আমার পিতা। তুমি পূর্ণ আমি তোমারই অংশ। ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে, 'আমি ব্রহ্ম, আমিই তুমি'। উত্তম ভক্ত বলে, 'ভগবান নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, জীব-জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ সে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না।"

আর যোগী। ভগবানের সঙ্গে যে সর্বদা যুক্ত থাকতে চায় সেই যোগীর কি অভিলাষ? রামকৃষ্ণ সে কথাও বললেন, "যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী মনকে নির্বিষ্ট করে, ধ্যানমগ্ন করে, বিষয় থেকে মনকে কুড়িয়ে নিয়ে। কিন্তু বস্তু একই, ভেদমাত্র নাম। তিনিই ব্রহ্মণ্, তিনিই আত্মন, তিনিই ভগবান।"[১]

ভগবানের সঙ্গে যোগী সর্বদা যুক্ত থাকতে চায়। ভক্ত কেশবচন্দ্র এই উপলব্ধিতেই যোগী।—

"ভক্তি যেমন আমার উপার্জিত বস্তু, যোগও তদ্রূপ। ধর্মজীবনের আরম্ভকালে যোগী ছিলাম না, যোগের নাম শুনিতাম না, যোগকথা জানিতাম না,......যোগের পথে কখনও চলিতে হইবে এ কথা চিন্তা করি নাই। খুব পুণ্যবান হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের অভিপ্রেতে কার্য সম্পন্ন করিব ইহাই যোগ জানিতাম। ...দশ পনের বৎসর সত্য, প্রেমে, বৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলাম। ...ঈশ্বর প্রসাদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। ক্রমে ভক্তি প্রমত্ততায় পরিণত হইল। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকিবে না। কোন পুস্তকে আমি তখন যোগের কথা পাই নাই। ......মৃদঙ্গের আকারে ভক্তির শাস্ত্র যখন আমার নিকট আসিল, তখন মনুষ্যের কথায় ভক্তিতে দীক্ষিত হই নাই। ঈশ্বরের প্রসাদবারি ভক্তির আকারে আসিল। সেই কোথা হইতে প্রবাহিত হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল। একদিকের বায়ু ভক্তি দিল, আর এক দিকের বায়ু যোগ। এইরূপে স্বর্গের দুই প্রান্ত হইতে দুইটি বায়ু প্রবাহিত হইয়া দুই ধন আনিয়া উপস্থিত করিল। হস্তগত হইলে বুঝিতে পারিলাম একে বলে ভক্তি আর একে বলে যোগ।

* * * *

যোগে যোগে সাংযোগ হইল, মহাযোগের ফল হইল। এদেশে আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলাম। কেন না অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈত সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতিয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিকই বাঁধিলাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিল। যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল, ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল।

* * * *

যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম) পৃষ্ঠা ৩৭-৪১

তৎ সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শন লাভ। ......এইরূপ দেখিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছি। কদিন বা সাধন করিলাম! শীঘ্রই সকল বন্ধুকে তোমাতে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজী শিখিয়া একজন যুবক যোগী হইল, বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দেখিলাম সভ্যতার ভিতরে যোগ জন্মিল। প্রেম ভক্তির মধ্যে যোগ হইল। যে হরিকে দেখা যায়, ন্যায় শাস্ত্রের বিচারে তাহাকে সিদ্ধান্ত করিলাম, মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই হরিকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

* * * *

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হরি আমার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তখন বুঝিলাম হরি তুমি কখনও মিথ্যা নও, বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌চক্ করিতেছে, চড়াৎ চড়াৎ করিতেছে।......

হে সত্য, হে জলন্ত ঈশ্বর! আমি তোমায় দেখিয়াছি। তুমি কথা কও, কথা কও। আমি মস্তিষ্কের ঈশ্বর মানি না, বাল্যকাল হইতে আমি তোমায় মানিতেছি।"

[ জীবন বেদ—যোগ। ]

এ উপলব্ধিতেই কেশবচন্দ্র যোগী।

বাষ্পীয় যান ভাগীরথীর জল কেটে কেটে কলকাতার দিকে চলেছে। কারো কোন হুঁশ নেই। জাহাজে আছে না কোথায় আছে সে জ্ঞানও বোধহয় নেই। জাহাজ কতদূর এল, এখন কোথায় রয়েছে তাও খেয়াল নেই। রামকৃষ্ণের অমিয়বচনে সকলে মজে গেছে। এ যেন যাদু মন্ত্র। ঘোর বিষয়ীর মনটাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও বিকল করে অন্য আর এক রকমের সচল করে তোলে।

জাহাজ দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে গেছে। নদীর তরঙ্গ ধ্বনিও কানে যাচ্ছে না, সকলে চেয়ে আছে সুন্দর নির্মল ওই মানুষটির দিকে।

বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা রামকৃষ্ণ আবার বললেন, বিশষ করে কেশবচন্দ্রের দিকে ঝুঁকে,—"ব্রহ্মজ্ঞানী, যারা বেদান্তবাদী তারা বলে সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ ও শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু আর সবই অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। 'আমি ধ্যান করছি,' 'আমি চিন্তা করছি'; এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।" একটু থেমে রামকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, "তাই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। একটিকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তিকে মানতে হয়। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

রামকৃষ্ণ-ভাণ্ডারে—উপমার শেষ নেই, তিনি বলে চলেন, "দুধ কেমন? না, ধোবো, ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

ক্ষণ বিরতির পর গম্ভীর গলায় পুনর্যোজনা করলেন, যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে কথা বলছেন;—

—"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করছেন। ওই আদ্যাশক্তিই কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়

প্রভৃতি কোনও কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাকে ব্রহ্ম বলি। যখন তিনি সব কাজ করেন, তাঁকে বলি কালী, বলি শক্তি। একই ব্যক্তি নামে রূপে ভেদ। তিনি এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'গড', কেউ বলছে 'ব্রহ্ম', কেউ 'কালী', কেউ বলছে 'রাম,' 'হরি', 'যীশু', 'দুর্গা'।" আরও প্রাঞ্জল করে বোঝালেন রামকৃষ্ণ যে একই ঈশ্বর বহু হয়েছেন।

"যেমন জল, ওয়াটার, পানি; পুকুরের একঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায় তারা বলে 'ওয়াটার'।"

রামকৃষ্ণের কথায় সবাই খুশী। গভীর দার্শনিক-তত্ত্ব সরল করে তিনি বোঝালেন। কেশবচন্দ্র হাসিমুখে বললেন, "কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথা একবার বলুন।"

রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মুখপানে চেয়ে মৃদু হাসলেন। হাসি হাসি মুখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "ঈশ্বরী নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামা কালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে রয়েছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, আর এই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না; জগৎ নিবিড় আঁধারে মগ্ন ছিল কেবল 'মা' নিরাকারা মহাকালী বিরাজ করছিলেন মহাকালের সঙ্গে।

শ্যামাকালী বরাভয় দায়িনী কোমল ভাবাপন্না। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁর পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় তখন রক্ষা কালীর পূজা করতে হয়। মা, আর্তকে রক্ষা করবেন।"

তারপর তিনি শ্মশান কালীর ব্যাখ্যা করলেন, "শ্মশান কালীর সংহারিণী মূর্তি। তিনি শ্মশানে অধিষ্ঠিতা, শব-শিবা-ডাকিনী-যোগিনী-ভূত-পেত্নী পরিবৃতা, রুধির-ধারা-প্লুতা, গলে মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কটিবন্ধ, করাল বদনী ভীমা ভয়ঙ্করী মা। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে সংগ্রহ করে রাখেন।" তারপর উপমা দিয়ে বললেন, "গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে জানত, ঠিক তেমন।"

কথা শুনে কেশবচন্দ্র হেসে উঠেন, অন্যরাও হাসিতে যোগ দিলেন।

"হ্যাঁ গো, গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাড়ি থাকে"—মৃদু হেসে রামকৃষ্ণ বলেন, "তার ভেতরে সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি বাঁধা শশার বিচি, এই সব রাখে, দরকার মত বের করে। মা ব্রহ্মময়ী ঐসব বীজ কুড়িয়ে রাখেন সৃষ্টি নাশের পর। সৃষ্টির পর আদ্যা শক্তি জগতের ভেতরই থাকেন।" তারপর আরও স্পষ্ট করে বললেন, "বেদে আছে ঊর্ণনাভের কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভেতর থেকে জাল বের করে আবার নিজে সেই জালের ওপর থাকে।" ক্ষণিক বিরতির পর পুনরায় বললেন, "ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুইই। কালী আমার মা—কালী নির্গুণা ও সগুণা। কালী কি কালো? দূরে তাই কালো—জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ কোন রং নেই। সমুদ্রের জল দূরে

থেকে দেখ—নীল, কাছে যাও হাতে তুলে দেখ—রং নেই।" এই মনোমুগ্ধকর কথাগুলি বলে তিনি গান ধরলেন,—

"শ্যামা মা কি আমার কালো রে
কালোরূপ দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলো রে।"

গান থামলে স্মিত মুখে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের দিকে চাইলেন, মনের ভাবে যেন বলতে চাইলেন, "ও গো, আমার শ্যামা মায়ের রূপ একবার অনুভব করলেই মজে যাবে, দেখা তো দূর" ; তারপর বললেন, "বন্ধন ও মুক্তি এ দুয়েরই তিনি কর্তা, তাঁরই মায়াতে সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে বন্ধ আবার তাঁরই দয়াতে মুক্ত।" কথা বলে তিনি ধ্যান মগ্ন হলেন, তারপর অস্ফুটে "মা আমার ভব-বন্ধন-হারিণী-তারিণী।" বলেই ভাবাবেগে আকুল হয়ে গান গেয়ে উঠলেন,

"শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি,
( ভব সংসার বাজার মাঝে )
আশা বায়ু ভরে উড়ে
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
কাক দণ্ডি মণ্ডি গাথা
পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা
কারিগরির বাড়াবাড়ি।
বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।"

সঙ্গীত-আকুতি চতুর্দিক মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। কিছু সময় নীরবতার পর ঈষৎ ধরা গলায় রামকৃষ্ণ বললেন, "তিনি লীলাময়ী, সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি তো সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে আটকে রেখেছেন।"

রামকৃষ্ণ হাসি মুখে উত্তর দিলেন, "এসবই তাঁর ইচ্ছা গো, লীলাময়ীর লীলা। তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে তবে খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ির অসন্তোষ। খেলা যে তবে শেষ হয়ে যাবে। খেলা চললে বুড়ির আহ্লাদ। তাই লক্ষের দু'একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।"

"আহা, কি সুন্দর কথা!"—কেশবচন্দ্র আনন্দে বলে উঠলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, "তিনি মনকে আঁখি ঠেরে, ইশারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা'। মনের কি দোষ বল? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে

ফিরিয়ে দেন, তাহ'লে বিষয় বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।"

রামকৃষ্ণ সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গাইছেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি, জেনেছি, আশয় পেয়েছি
এসব তোমার চাতুরী।
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে
দিতাম খাওয়াতাম তোমারি॥
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস ও গো সকল রস তোমারি।
রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।
( ও মা ) তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি॥"

রামকৃষ্ণ সর্বগুণাধার। কি সুললিত সুকণ্ঠ তাঁর। যখন গান গাইতে থাকেন সে গান হয়ে উঠে অমৃত সঙ্গীত। শ্রোতাকে বিহ্বল করে, রোমাঞ্চিত করে। আর ভাবের কি অভিব্যক্তি। মনেও থাকে তার কতরকম গান—আশ্চর্য।

ধ্যানমগ্ন আঁখি দুটি মেলে তিনি বললেন, "তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে, "মন দিয়েছ মনেরি আঁখি ঠারি।"

তারপর তিনি বললেন যে সংসার থেকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে, তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।

একজন জিজ্ঞাসা করল, "সর্বস্ব ত্যাগ না করলে কি ঈশ্বর পাওয়া যাবে না ?"

"না গো, তোমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে কেন ?" আশ্বাসের হাসি হাসছেন রামকৃষ্ণ, "তোমরা রসে বসে বেশ আছ। সারে মাতে তোমরা বেশ আছ।" ওঁর কথায় সকলে হেসে ওঠে।

"নক্স খেলা জান ? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছে, কেউ পাঁচে আছ। বেশী কাটাও নি। তাই আমার মত জ্বলে যাও নি। খেলা চলছে। এতো বেশ"—তাঁর হাসিতে সবাই যোগ দিল।

"সত্যি বলছি তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নেই," অভয়-আশ্বাস রামকৃষ্ণের, তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম কর আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রংএ ছুপবে। দেখ না যদি একটু ইংরাজি পড় তো মুখে অমনি ইংরাজি কথা এসে পড়ে ফুট্‌ফাট্—ইট্‌মিট্।"

কেশবচন্দ্র কথা শুনে আনন্দের হাসি হাসলেন। রামকৃষ্ণও হাসছেন, বললেন,

"আবার পায়ে বুট জুত পরা, শিষ দিয়ে গান করা, এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ তো সেই রকম কথাবার্তা, সেইরকম চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে থাক, ঈশ্বর-চিন্তা, হরি কথা এই সব হবে।"

কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন। মনে মনে ভাবছেন কি অপূর্ব ভাবরঞ্জিত কথা! কত রস পরিপূর্ণ করেই না বলছেন রামকৃষ্ণ। একেই বুঝি বলে রসে বশে থাকা।

"মনই তোমার সব", রামকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট করলেন, "একপাশে স্ত্রী, অন্য পাশে সন্তান, তাদের সঙ্গে এক শয্যায় শুয়েছ। এক এক জনকে এক এক ভাবে আদর করবে। কিন্তু মন তোমার সেই একই মন।"

সবাই যে জাহাজে চলেছে সেকথা খেয়ালই নেই কারো, রামকৃষ্ণের বলার ভঙ্গিমায় এমনই আকৃষ্ট। এখন গঙ্গায় ভাঁটা চলছে। জাহাজ তাড়াতাড়ি চলেছে কলকাতার দিকে। পোল পেরিয়ে কোম্পানীর বাগানের দিকে আরও খানিকটা যাবে।

কেশবচন্দ্র একজন ব্রাহ্মভক্তকে ডেকে কিছু বললেন। তারপর মুড়ি আর নারকোল দেওয়া হ'ল সবাইকে। কেউ হাতে, কেউ কাপড়ের কোচরে মুড়ি নিয়েছেন, পরমানন্দে সকলে মুড়ি নারকোল খাচ্ছেন। সকলের হাসি মুখ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অদূরে বসে আছেন ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এখনও পর্যন্ত পরস্পরে কোনও কথাবার্তা হয়নি। কেশবচন্দ্র দু'একবার বিজয়কৃষ্ণের দিকে চেয়েছেন, তারপর বেদনায় চোখ ফিরিয়েছেন অন্যদিকে। রামকৃষ্ণ মুড়ি নারকোল মুখে দিয়ে ওঁদের দু'জনকে দেখলেন! এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজ পাশে বসেও কত দূরে। এমন কেন হবে? রামকৃষ্ণ মনে মনে স্থির করলেন দুজনার ভুল বোঝাবুঝি দূর করবেন। কেশবচন্দ্রের দিকে হেসে বললেন, "ও গো, বিজয় এসেছে দেখেছ? তোমাদের দুজনার ঝগড়া যেন শিব আর রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হ'ল আবার দুজনের ভাবও হ'ল। কিন্তু এদিকে শিবের ভূত প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলোর কিচিরমিচির আর মেটেনা।" রামকৃষ্ণের কথায় কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ দুজনাই অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

—"আপনার লোক, তা এমন হয়ে থাকে। লবকুশ তো রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।" ঈষৎ হেসে রামকৃষ্ণ বলে চলেন, "আবার জান মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের, এর একটি সমাজ আছে আবার ওর একটি দরকার।" —এবার রামকৃষ্ণের রসের কষাঘাতে সকলের মুখেই অপ্রস্তুত ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা গেল।

রামকৃষ্ণ হাসেন তারপর আবার বলেন, "যদি বল ভগবান নিজে লীলা, করছেন সেখানে জটিলে কুটিলের কি দরকার? —দরকার আছে, জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না।"

কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের কথায় পরস্পরের দিকে চেয়ে এবার উচ্চকণ্ঠেই হেসে উঠলেন। রামকৃষ্ণ আরও উপমা দিলেন, উপমার সরসতায় দুজনের মনের ভার লঘু করলেন।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দু'জনে অমিল। গুরুশিষ্য, পরস্পরের মত খণ্ডন করতে লাগলেন। এমন হয়েই থাকে। যা হোক তবু আপনার জন।"*

তারপর রামকৃষ্ণ বললেন, "ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। একবার তাঁর নাম গাও তোমার সব কলুষ তিনি ধুয়ে দেবেন।" একথা বলে ভাবোন্মত্ততায় গান গেয়ে উঠলেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তরো কেমন,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এসব পাতক না করি তিলেক,
ব্রহ্মপদ নিতে পারি।"

গান সমাপ্ত করে হাসি মুখে বললেন, "আমি মার কাছে চেয়েছিলুম কেবল ভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি। ফুল হাতে মার চরণে অঞ্জলি দিয়ে বলেছিলাম, 'মা গো এই নাও তোমার পুণ্য আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

রামকৃষ্ণের কথায় কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে উঠলেন, "শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি।" কিছু সময় নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'ল। তারপর রামকৃষ্ণ বললেন, "শোন, একটা রামপ্রসাদী শোন" বলে গান ধরলেন,

"আয় মন বেড়াতে যাবি—
কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মায়া, তার নিবৃত্তি রে সঙ্গে লবি ( লিবি )।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে করে শুবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।
অহংকার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটায় ধরে রবি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্যার সন্তানে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥"—

* কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তবুও আগের মত বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারেন নি যদিও মনের ভার লঘু হওয়ায় দুজনাই দু'জনের কাছে সহজ হতে পেরেছিলেন.।

গান থামল। কেশব রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে ভাবছেন, এঁর ভিতর এতজ্ঞান, এত দৃঢ়তা, এত প্রেম, এত কোমলতা। গানটির মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য বোঝালেন। দৃঢ় গলায় বললেন, "সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন ? নিশ্চয়ই হবে। জনক রাজার হয়েছিল। প্রসাদ বলেছে, 'সংসার ধোঁকার টাটি।' কিন্তু যদি তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ হয় তা হ'লে—

"এই সংসার মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি,
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে এদিক ওদিক দু'দিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটি।"

রামকৃষ্ণ সুর করে পদটি গাইলেন। আনন্দে উজ্জ্বল সকলের মুখ চোখ। আশ্চর্য ! কি সহজ সুন্দর প্রত্যয়ের ছোঁয়ায় মানুষের মন থেকে সংশয়, ভয় প্রভৃতি কাটিয়ে দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্রের মনের আনন্দ বুঝি আরও বেশি কারণ তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে এগুল মিলে যাচ্ছে পরন্তু আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করছে। তিনি রামকৃষ্ণকে বললেন, "গৃহস্থের ভগবান লাভের উপায় সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।"

সে কথাই বলছেন রামকৃষ্ণ এবার, কি করতে হবে সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। শুধু-দুধ থেকে কি মাখন বা দধি হয় ? দুধকে জ্বাল দিতে হয়। তারপর নির্জনে গিয়ে মন্থন করতে হয়, তারপর পাত্রে ঢেলে জমাতে হয়, তবে দধি হয়। সাধনার দরকার, সে কথাই বলছেন।

"কিন্তু ফস্ করে বাপু জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিল। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাইরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। লোকে স্ত্রী পুত্রের জন্য একঘটি কাঁদে কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বল ? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। সংসারের মধ্যে কর্মের ভিতর থেকে প্রথমে মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়।"

কথাটা উপমা দিয়ে আরও সহজবোধ্য করলেন, "যেমন ফুটপাথের গাছ ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া, গুঁড়ি হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দাও, তাও কিছু হবে না। রোগটি হচ্ছে বিকার, আবার যে ঘরে বিকারের রোগী সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী, বিষয় জলের জালা, বিষয় ভোগ তৃষ্ণা, জল তৃষ্ণা।" তারপর সরল করে বোঝালেন, "আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না। এমন জিনিস তোমার ঘরে আছে। কি জিনিস ? না, যোষিৎ সঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।"—

"বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হচ্ছে হলুদ।"

বিবেক কি ? না, সৎ অসৎ বিচার। রামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন, "ঈশ্বর সৎ, নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য দু'দিনের তরে। এই রকম বোধ চাই। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান-ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেমন টান ছিল তেমন। শোন একটা গান গাই", একথা বলে গান ধরলেন ;—

"বংশী বাজিল ঐ বিপিনে
( আমার তো না গেলে নয় )
( শ্যাম পথে দাঁড়িয়ে আছে )
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো।
( তোদের শ্যাম কথার কথা )
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা ( সই ) ॥
তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে,
বাঁশী আমার বাজে হৃদি মাঝে।
শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরোও রাই,
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই।"

গান গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণের চোখ দুটি ছল ছলিয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্রের চোখেও প্রেমাশ্রু। ব্রাহ্মভক্তদের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ বললেন, "ও গো, তোমরা রাধাকৃষ্ণ মান আর নাই মান, ভালবাসার এই টানটুকু নিও। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে চেষ্টা কর। হৃদয়ে ব্যাকুলতা থাকলেই তিনি আসবেন।" ঈষৎ জড়ান গলায় কথা কটি বললেন তিনি, হাসিখুশী আনন্দময় মুখ। ও মুখখানি দেখলে মানুষ দুঃখ-বেদনা সব ভুলে যায়। সর্বরোগ হর রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য।

আনন্দিত সকলে রামকৃষ্ণ-বাক্য-সুধা শ্রবণে।

কেশবচন্দ্র বললেন, "আজ বেশ আনন্দ লাভ হল। আনন্দ এই কারণে হচ্ছে যে সবাই সহজে অনেক গূঢ় সত্য বুঝতে পারল। আপনার কথা আরও ছড়িয়ে পড়ুক।"

রামকৃষ্ণ হাসলেন, বললেন, "মার কথা, আমার নয়। মা আমায় বলায়, আমি বলি।" তারপর নিকটে কেশবই যেন একমাত্র উপস্থিত ব্যক্তি, আর কেউ নেই, এমন ভাব নিয়ে গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বললেন, "কেশব তুমি প্রকৃতি দেখে দলে লোক নাও না, তাই এমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব এক কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কারো ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারো রজোগুণ বেশী, কারো আবার তমোগুণ। পুলিগুলো বাইরে থেকে দেখতে সব একই রকমের কিন্তু ভেতরের পুর আলাদা। কারো মধ্যে ক্ষীর, কারো মধ্যে নারকেলের ছাঁই, কারো মধ্যে কলার পোর।"—

ক্ষণিক বিরতি নিয়ে তিনি আবার বললেন, "আমার কি ভাব জান ? আমি খাই, দাই, থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা। গুরু হলেন সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দেবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য হতে কে চায় ?" রামকৃষ্ণ যেন কেশবচন্দ্রের মনের কথাই বললেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁর 'জীবন বেদে'এ কথাই বলেছেন।—

"লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন কাজ" কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে রামকৃষ্ণ বলেন, "যদি তিনি দেখা দেন আর আদেশ করেন তবে হতে পারে। নারদ, শুকদেব প্রভৃতির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের হয়েছিল। আদেশ না হ'লে কে কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জান? যতক্ষণ কাঠে জাল দেওয়া, দুধ ততক্ষণ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নেই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়ো খুঁড়ছে, বলে জল চাই, সেখানে পাথর বেরুল তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করল। এই রকম। আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য সত্যই দেখা দেন আর কথা বলেন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার কত জোর। পর্বত পর্যন্ত টলে যায়।"...

একটু থেমে সরস উপমার সাহায্যে বোঝাচ্ছেন, "ওদেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। লোকে তার পাড়ে রোজ সকালে বাহ্যে বসত। যারা সকাল বেলা আসে খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেই রকম। বাহ্যে আর থামে না!" কথা শুনে সকলে হাসছে। রামকৃষ্ণ বলে চলেন, "তখন লোকে কোম্পানীকে জানাল। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সে তখন এসে একটা কাগজ সেঁটে দিল। "বাহ্যে করিও না", তখন সব বন্ধ।"

হাসি হাসি মুখে তিনি উপসংহারে বললেন, "লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হয়ে পড়ে। শুধু লেকচারে কাজ হয় না, লোকে শোনে না। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক। কানা কানাকে পথ দেখাচ্ছে। হিতে বিপরীত হয়। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়। আর আদেশ না থাকলে, "আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি" এই অহংকার হয়। অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধহয় আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন। আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। আমি কর্তা, এ বোধ থেকেই যত দুঃখ আর অশান্তি।"—

এরপর রামকৃষ্ণ কর্মযোগ সম্বন্ধে বললেন, "তোমরা বল, জগতের উপকার করা। জগৎ কি এতটুকু গা? আর তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত বললেন, "যতদিন না ঈশ্বর লাভ হয়, ততদিন কি সর্বকর্ম ত্যাগ করতে হবে?"

"না, না, কর্মত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ গান, নিত্য কর্ম এসব করতে হবে।"

ব্রাহ্মভক্তটি আবার বললেন, "আর সংসারের কর্ম? বিষয় কর্ম?"

"হ্যাঁ, তাও করবে, সংসার যাত্রার জন্য যতটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাতে ঐ কর্মগুলো নিষ্কাম ভাবে করা যায়। আর বলবে যে 'হে ঈশ্বর, আমার বিষয় কর্ম কমিয়ে দাও। কেন না প্রভু, দেখছি যে বেশী কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়ত দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছে হয়। আগে যো সো

করে ধাক্কা থাক্কি খেয়ে কালী দর্শন করতে হয়। তারপর দান যত কর আর না কর।" এই কথা বলে শম্ভু মল্লিককে কি বলেছিলেন তাই বলছেন ;—

"শম্ভু মল্লিককে বললুম, সামনে যেটা পড়ল, না করলে নয় তাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছে করে বেশী কাজে জড়ানো ভাল নয়। ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে এসে দানই করতে লাগলে, কালী দর্শন আর হ'ল না। ঈশ্বর লাভের জন্যই জীবের কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম, 'যদি ঈশ্বর দেখা দেন তাঁকে কি বলবে কতগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি করে দাও? না, ভক্ত কখনও তা বলে না, বরং বলবে, 'ঠাকুর, আমায় তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও। সর্বদা তোমার নিজের সঙ্গে রাখ, শুদ্ধা ভক্তি দাও।"—

কেশবচন্দ্র একাগ্রমনে কথাগুলি শুনলেন। রামকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, "কর্মযোগ বড় কঠিন যোগ। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে তা কলিকালে করা বড় কঠিন। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।" একথা বলে কেশবচন্দ্রের দিকে চাইলেন, পরে বললেন, "তোমাদের ভক্তি যোগ, তোমরা হরি নাম কর, মায়ের নাম নাও, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বল না। অমন ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে অবশ্য পাবে।" বলে রামকৃষ্ণ গান ধরলেন—

"আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি
নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে
দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী।"

জাহাজ কয়লাঘাটে ফিরে এল। সকলে নামবার তোড়জোর করতে লাগলেন। কেবিন-ঘরের বাইরে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসছে, নভঃমণ্ডল তারায় ভরা, কোজাগর পূর্ণিমা-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছে। চাঁদের রূপালী আলো ভাগীরথীর বুকে পড়ে খেলা করছে। রামকৃষ্ণের জন্য গাড়ী আনতে লোক পাঠালেন কেশবচন্দ্র। গাড়ী এলে মহেন্দ্র গুপ্ত এবং আরও দু'চার জন ভক্ত ও কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল রামকৃষ্ণের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন। সকলে গাড়ীতে বসলে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কই, কেশব কই ?"

কেশবচন্দ্র কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার মুখে স্মিত হাসি, একজন ব্রাহ্মভক্তকে প্রশ্ন করলেন, "কে কে এ'র সঙ্গে যাচ্ছে ?" কারা সঙ্গে যাচ্ছেন তা জেনে নিয়ে কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে নমস্কার করলেন। রামকৃষ্ণও প্রতি-নমস্কার ও সস্নেহ সম্ভাষণ করে বিদায় নিলেন। কেশব একদৃষ্টে রামকৃষ্ণের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমাজের নানা কাজে কেশবচন্দ্র আজকাল এত ব্যস্ত থাকছেন যে দক্ষিণেশ্বরে সময় সুযোগ করে যেতে পারছেন না। তাঁর কানে এসেছে রামকৃষ্ণ অভিমান ভরে বলেছেন কাকে যেন যে কেশবের কত কাজ, —উপাসনা, লেকচার, কাগজে লেখা, সমাজ-সংস্কার, সময় কোথা যে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে আসবেন। আশ্চর্য মানুষটি এত ভালবাসে তাঁকে! যে হোক করে ওঁর কাছে যাওয়া উচিত একবার, তাছাড়া তাঁরও মন যে টানে দক্ষিণেশ্বরে সেই আত্মভোলা প্রিয়জনের গভীর প্রেম। নিজেকে ধন্য মনে করেন কেশব, এতদিন না যেতে পারার জন্য অপরাধী মনে হয় নিজেকে। আজকাল শরীরটাও বইতে চায় না, যেন কোন রকমে টিকে আছে। অথচ কত কাজ বাকি, কিছুই ত শেষ হয়নি। অবশ্য চিকিৎসা, বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনে শরীরটা তাঁর কিছু সেরেছে। ডাক্তাররা পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। উনি বিশ্রাম নেবেন? নিজের শরীরের প্রতি দৃকপাত নেই ওঁর। অনুগত প্রিয়জনদের মধ্যে আলোচনা হয়, কেশবচন্দ্রের বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ওঁকে বিশ্রামে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, চির-বিশ্রামের আগে ওঁর বুঝি বিশ্রাম-আরাম নেই। বেদনায় সবার প্রাণ ভরে উঠে।

ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' দেশে যুগান্তর এনেছে। যদিও রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হ'বার আগে থেকে 'নববিধানের' ভাব উদিত ছিল, তবু পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রেমের ধর্ম তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে।

এত কাজের মধ্যেও, অসুখ যন্ত্রনার মধ্যেও প্রায়ই কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণকে মনে পড়ে যায়। নানান সংসারের মানুষের মনের বিকৃতির সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে পড়ে তখন ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে দক্ষিণেশ্বরের সেই সুশীতল মহীরুহের তলায় যেখানে ঈশ্বর-কথামৃতে প্রাণ তৃপ্তি পায়। শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁর মন আরও হু হু করে।

অপাপবিদ্ধ প্রেমের মানুষটি তুলনাহীন, কেশবচন্দ্রের মনে হয়। শুধু ভালবাসা! কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদীদের তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনাও রামকৃষ্ণ সহ্য করতে পারেন না, এ কথা তিনি জানেন।

এই গভীর আত্মিক সম্বন্ধের তুলনা নেই। কেশবচন্দ্র লোকমুখে শুনেছেন যে কোচবিহার বিবাহ উপলক্ষে একজন কটাক্ষ করলে রামকৃষ্ণ তাকে উচিত কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গে আলোচনা কালে ভক্তটি বলেছিল, "টাকা কড়ির চেষ্টা তো সকলেই করছে। কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।"

তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কেশবের আলাদা কথা। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তাঁর সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার ব্যাটা সে মাসোহারা পায়। উকিল ফুকিলের কথা বলছি না, যারা কষ্ট করে লোকের দাসত্ব করে টাকা আনে।

আমি বলছি ঠিক রাজার বেটা, যার কোন কামনা নেই। সে টাকা কড়ি চায় না। টাকা আপনি আসে।"

কেশবচন্দ্র হলেন তেমন রাজার বেটা, তার যদৃচ্ছা লাভ। এঘটনা কেশবচন্দ্রের অজানা নয়। তাছাড়া রামকৃষ্ণ বহুবার তো বলেছেন, "কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।"[১]

যতই 'নিরাকার', 'নিরাকার' করুন, কেশবচন্দ্রের মজ্জায় মজ্জায় ভক্তিরস। অন্তরে তো তিনি জগজ্জননীর চির পূজারী, কিন্তু রামকৃষ্ণের সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় বাধভাঙ্গা বন্যার মত তার প্রকাশ হ'ল; "এই কি আমার মৃণ্ময়ী আধারে চিন্ময়ী মা?"

এই ভাবনার আনন্দে পুলকিত হ'তে হ'তে রামকৃষ্ণের কথাই ভাবছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। রামকৃষ্ণ শুধু তাঁর বন্ধুস্থানীয় নন, তিনি তাঁর শ্রদ্ধা ভাজন। কেশবচন্দ্রের কাছে অধ্যাত্ম বিষয় সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে বা বুঝতে এলে তিনি বিশদ বুঝিয়ে দেন আবার কখনও কখনও বলেন, "ঐ বিষয়ে যা যা দ্বিধা সন্দেহ দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-দেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি আরও ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন।"

অন্যদিকে আবার রামকৃষ্ণও কখনও কখনও কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে নিকটে উপবিষ্ট কেশবচন্দ্রকে দেখিয়ে বলেন, "ওই ওঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর।"[২]

টুকরো টুকরো এরূপ নানা কথা কেশবচন্দ্রের মনে পড়ছে। এও তিনি শুনেছেন যে দক্ষিণেশ্বরে বসে রামকৃষ্ণ একদিন একজন ভক্তকে বলেছেন,

"কেশব কি কম গা? যারা টাকা চায় তারাও মানে আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দ সরস্বতীকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। 'কেশব সেন, কেশব সেন' করে ঘর বার করছে, কখন সে আসবে। বুঝি তার আসবার কথা ছিল। কেশব হীনবুদ্ধির মানুষ নয়, ও আরও কোটিগুণে বাড়ুক।"

রামকৃষ্ণ ঠাট্টা করে কেশবচন্দ্রকে বলেন, "তুমি হ'লে জাহাজ আর আমরা জেলে ডিঙ্গি।"

রামকৃষ্ণের কথা কেশবচন্দ্র যত ভাবছেন, তত অভিভূত হয়ে পড়ছেন। তিনি ধন্য। কতই না ভালবাসা তাঁর প্রতি রামকৃষ্ণের। অথচ কিইবা গুণ আছে তাঁর। তিনি সামান্য। ওঁর ধারণা আপন মহত্বেই রামকৃষ্ণ তাঁকে এত বড় করে দেখেন। মনে মনে রামকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্র নমস্কার জানালেন। ও'র প্রেম পরশমণি তাঁর অন্তর আলোয় ভরে দিয়েছে, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিয়েছে। রামকৃষ্ণের প্রেমের কথা স্মরণ করে কেশবচন্দ্রের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়।

কিন্তু যাই যাই করেও আর যাওয়া হ'ল না। নব বিধানের নানা কাজে কেশবচন্দ্র আটকে পড়লেন, আবার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হল। শরীর আর মানে না। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বর, বহুমূত্র এমন কি রক্ত বমনও হচ্ছে। এ যাত্রায় কেশব বোধহয় টাল সামলাতে পারবেন না।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ১৭

২ Keshab Chandra and Ramkrishna by G. C. Banerjee, 1st edition, Page 170

চারিদিকে খবর চলে গেছে আচার্য কেশবচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ। কখন কি হয় ঠিক নেই।

দক্ষিণেশ্বরে বসে রামকৃষ্ণ খবরটা শুনলেন। অন্তর হায় হায় করে উঠল তাঁর। কি যে হতে চলেছে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন তিনি। ব্যাকুল হয়ে উঠেন, "ও গো, আমি কেশবকে দেখতে যাব। তার যে বড় অসুখ শুনি।"—পরিচিত যাঁরা দেখা করতে আসেন তাঁদের বলেন।

অবশেষে অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে দেখতে রামকৃষ্ণ কলকাতা রওনা হলেন।[১] কমলকুটিরে আগেই খবর পাঠান হয়েছে। কমলকুটিরের বহির্দ্বারে একজন ভক্ত অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ আসছেন। তাঁকে আসতে দেখলেই ভিতরে খবর দেবে। বেলা দুটো থেকে ভক্তটি অপেক্ষা করছে। পথে কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে।

রাস্তার পূবপাশে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া কলেজ। এটি মহিলা শিক্ষা নিকেতন। পথ থেকে বিদ্যামন্দিরের ভিতরের অনেকটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। অপেক্ষারত ভক্তটি দেখলেন কলেজের ভিতরে একটি শিক্ষকের কোয়ার্টারে কেমন বিষাদ মলিন আবহাওয়া। শিক্ষকটি ইংরাজ খৃষ্টান। ঐ কোয়ার্টারে কেউ মারা গেছে, কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী দুটি লোক মৃতের কফিন নিয়ে আসছে। ভক্তটির মনেও অজ্ঞানিত একটি ভয় জাগে।

মৃত্যু মানব আত্মাকে কোথায় নিয়ে যায় ?

গাড়ী আসছে, গাড়ী যাচ্ছে।

বিকাল পাঁচটায় রামকৃষ্ণ, লাটু, মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রগুপ্ত, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের নিয়ে গাড়ী করে এলেন। গাড়ী থেকে ধীরে ধীরে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি নামলেন। মনে হল উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন কোথায় কতদূরে চলে গেছে। ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁকে ধরে সযত্নে গৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণের গায়ে সবুজ রংএর জামা—বেনিয়ান।

বৈঠকখানায় দক্ষিণের বারান্দায় ফরাস বিছান তক্তোপোষে রামকৃষ্ণ উপবেশন করলেন। তারপর হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলেন। যাঁকে দেখতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন তাঁকে কখন দেখবেন ? কণ্ঠে শিশুর অধৈর্য নিয়ে বলবেন; "ও গো কেশব কেমন আছে বল না ?" এখন কেশবচন্দ্রের শারীরিক অবস্থা খুবই মন্দ। ডাক্তার বদ্যি সদা ব্যস্ত, যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকদের এক রায়, কেশবচন্দ্রের পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। অবিশ্রাম কর্মপ্রবাহের এখন বিশ্রাম চাই।

রামকৃষ্ণ যখন গিয়ে পৌঁছুলেন, কেশবচন্দ্র তখন নিদ্রাবেশে বিশ্রাম করছেন।

---

[১] ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

তাঁর অনুচরেরাও ব্যস্ত যাতে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না হ'য়। চিকিৎসকদেরও এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ আছে। অধীর রামকৃষ্ণকে বিনয় নম্রতায় ব্রাহ্মভক্তরা জানান, "উনি বিশ্রাম করছেন, একটু পরেই আসছেন।"

কেশবচন্দ্র যদি জানতেন রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখতে এসেছেন তা হ'লে কি আর দেরি হয়, তিনি যে নিজেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। ভব-রোগ যন্ত্রণার উপশমের ওষুধ যাঁর কাছে মর-রোগের চিকিৎসকের নির্দেশ সেখানে কি ব্রহ্মানন্দ কেশব মানতে পারেন ?

রামকৃষ্ণ আর অপেক্ষা করতে পারেন না, কেশবকে কখন দেখবেন, যারা তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছে তাঁদর অধীর কণ্ঠে বললেন, "হাঁগা, তার ( কেশবের ) আসবার কি দরকার ? আমি ভেতরে যাই না কেন ?"[১] অসুস্থ প্রিয়জনকে কেন আর কষ্ট দেওয়া, তাকে দেখতে এসেছি, দেখে কথা বলে চলে যাওয়া। ব্যাকুল মন শান্ত হবে তাতে।

প্রসন্ন সেন জোর করে সবিনয়ে বললেন, "আজ্ঞে তিনি এই এলেন বলে।"

এবার রামকৃষ্ণ অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, বললেন, "যাও, তোমরাই এমন করছ, আমিই ভেতরে যাই। তাকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।"

তাঁর কথা শুনে প্রসন্ন সেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। কি আর করেন, রামকৃষ্ণকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন ;—

"জানেন ওঁর অবস্থা এক রকমের হয়ে গেছে। আপনারই মত মার সঙ্গে কথা ক'ন। মা ওঁকে কি বলেন, তাই শুনে হাসেন কাঁদেন !"[২]

তারপর প্রসন্ন রামকৃষ্ণকে জানান যে ইদানীংকালে কেশবচন্দ্র প্রায় সময়েই "মা, মা" বলে ব্যাকুল হচ্ছেন। যখন 'মা' বলে ডাকেন তখন তাঁর চোখ মুখ দিয়ে অপূর্ব জ্যোতির ছটা বেরোয়। এত যে অসুখে কষ্ট তবু মুখে সর্বদা হাসি খেলছে। রোগযন্ত্রণা একবারও কারো কাছে প্রকাশ করেন না। জগৎ জননী বুঝি কেশবচন্দ্রকে কোল দিয়েছেন।

প্রসন্ন সেনের কথা শুনে রামকৃষ্ণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, "কেশব মার সঙ্গে কথা কয় ! জানি মা কেশবকে দেখা দেবে। মা, তোমার সঙ্গে কেশব কথা কয় ! মা—মা—।" বলতে বলতেই তাঁর ভাব সমাধি ঘটল। স্থির-নিবাত নিষ্কম্প মূর্তি, দৃষ্টি স্থির। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় তিনি রইলেন, সমাধি আর ভাঙ্গে না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ক্রমে রামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হ'লেন। বৈঠকখানায় ততক্ষণে গ্যাসের আলো জেলে দিয়ে গেছে। রামকৃষ্ণকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে আসা হ'ল। তাঁকে কৌচের উপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল আর সেখানে বসেই তিনি আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধি মগ্ন হলেন। ভাবের ঘোরে চতুর্দিক চেয়ে চেয়ে দেখছেন। তিনি ইষৎ ধরা গলায় বললেন,

"আগে এসব দরকার ছিল, এখন আর কি দরকার ?" তারপর রাখালের দিকে ফিরে বললেন, "রাখাল তুই এসেছিস ?" রাখাল কিন্তু তাঁর সঙ্গেই এনেছেন। মনে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ৯ম সংস্করণ পৃঃ ৮২

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৪র্থ), ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৮২

হ'ল কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণ ঘরের একস্থানে একদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন দেখছেন। কিছু সময় গেলে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "এই যে মা এসেছ। আবার বেনারসী কাপড় পরে কি দেখাও। মা, হাঙ্গামা কর না, বস, গো বস।"[১]

ঘরটি আলোয় আলোকিত। মহাভাবের ঘোর চলেছে তাঁর। ব্রাহ্মভক্তরা, রাখাল লাটু, মাস্টার প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। নির্মিলিত নেত্র রামকৃষ্ণের, মুখে তাঁর মৃদু মধুর হাসি, মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গীয় জ্যোতি। সকলের চোখে মুখে অপার বিস্ময়; বিমল আনন্দ! কি হয়, কি হয় ভাব!

রামকৃষ্ণ বলে চলেছেন, "দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নেই। যেমন সুপুরি;—পাকা সুপুরী ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা,ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে তাঁকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা, বোধ হয়।"

এ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ? সকলের মনে এক অজানা আশঙ্কার ভাবনা ছেয়ে থাকে। তবে কি কেশবচন্দ্র মর দেহে আর থাকবেন না? অস্থির রামকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, "ও কেশব! আমি অনেক দূর থেকে তোমায় দেখব বলে এসেছি। একবার দেখা দাও, আমি আর থাকতে পারছি না।"

তাঁর কথাও শেষ হ'ল আর কেশবচন্দ্রও ঘরে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। ভাবে বিহ্বল। যাঁরা ইদানিং কালে কেশবচন্দ্রকে দেখেননি তাঁরা তাঁকে দেকে দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবের এ কি করুণ চেহারা! এ তাঁরা কাকে দেখছেন। তিনি অসম্ভব রকমের কৃশ হয়ে পড়েছেন, সমগ্র অবয়বে দুর্বলতাও বেশ প্রকট! চোখ দুটি কোটরবদ্ধ কিন্তু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। একটু চললেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে তাঁর, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তবু মুখে কষ্টের চিহ্ন নেই, সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে অনাবিল অপার্থিব হাসি। কারও সাহায্য না নিয়ে কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে দেওয়াল ধরে এগিয়ে আসছেন। প্রিয়জন যাঁরা তাঁর দিকে চেয়ে আছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রাণ ব্যথায় টনটন করছে। কারও মুখে কথা নেই, ঘর জুড়ে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা।

নির্মলচিত্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবকে কঠিন অসুখ সত্ত্বেও আরও অপাপবিদ্ধ মনে হচ্ছে— আরও জ্যোতির্ময়, আরও শুদ্ধ সুন্দর। যাঁরা তাঁকে ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে বা টাউন হলে দেখেছিলেন—সুপ্রশস্ত উদার ললাট, উন্নত দেহ ও দীপ্তিপূর্ণ কান্তি, তাঁরা আজ এ অস্থিচর্মসার মূর্তি দেখে অব্যক্ত ব্যথায় মূক হয়ে গেলেন।

কেশবচন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, ঘরের দেওয়াল ধরে অগ্রসর হচ্ছেন। অনেক কষ্টের পর কোনক্রমে কৌচের সামনে এসে বসলেন। তাঁর মুখে বিষাদ-মলিন হাসি। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে রামকৃষ্ণ কত যে বেদনার্ত হয়েছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ইতি মধ্যে তিনিও কৌচ থেকে মেঝেয় নেমে বসেছেন।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৮৪

কেশবচন্দ্র কাছে এসে বেদনা-বিহ্বল রামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। চরণে শির স্পর্শ করে প্রণাম করলেন—অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ।

"যাবার আগে তোমাকে আজ শেষ প্রণতি জানিয়ে যাই। হে চির পবিত্র, প্রেমময়, চির জাগ্রত সত্য, তোমার প্রেমস্পর্শে আমি পরমমঙ্গলময় ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করেছি, মনের মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যালোকে আলোকময় হয়ে গেছে আমার আকাশ, সকল উপলব্ধি পেয়েছে ঠিকানা। আমি নিবিড় করে পেয়েছি সেই চৈতন্যময় পুরুষকে সেই চৈতন্যময়ী জননীকে যিনি ঈশ্বর। যাঁকে পাবার জন্য আমি অস্থির, উন্মাদ ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলাম। তোমার মাঝে আমি সেই আলো দেখেছি যা আমার তৃষ্ণা ছিল। হে আলোকময়! আমার আলো আজ তোমার আলোয় মিশে উজ্জ্বল হ'ল। আমার সকল চাওয়া আজ সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে গেছে। এবার আমার ছুটি। তুমি আমার আপন, তাই শেষ প্রণতির অঞ্জলি নাও।"

ঘরের বাতাস যেন প্রণামরত কেশবের হয়ে এই কথাগুলি বলে ওঠে।

অনেকক্ষণ ধরে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে উঠলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মুক্তিতীর্থ যাত্রী মুক্ত পুরুষ—যুগপুরুষ।

রামকৃষ্ণের মহাভাবের ঘোর এখনও তেমন কাটেনি। অস্ফুটে জগদম্বার সঙ্গে কি কথা যেন বলে চলেছেন। কেশবচন্দ্র ক্লান্ত উচ্চস্বরে টেনে টেনে বললেন, "আমি এসেছি, আমি এসেছি" বলে রামকৃষ্ণের বাম হাতখানি ধরলেন ও সে হাতে হাত বোলাতে লাগলেন। রামকৃষ্ণও কেশবের হাত ধরলেন। তিনি ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপন মনে বলে চলেছেন, "যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণ নানা বোধ, যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এইসব। পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য বোধ হয়। আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখি যে সেই এক চৈতন্য এই জীব জগৎ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।"[১]

বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে সবাই কথা শুনছে, রামকৃষ্ণ বলেচলেছেন, "তবে শক্তি বিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির বিকাশ, কোনখানে কমশক্তির প্রকাশ।"—

তিনি একটু থেমে আবার বললেন, "বিদ্যাসাগর বলেছিল 'তা ঈশ্বর কি কারোকে বেশী শক্তি, কারোকে কম শক্তি দিয়েছেন?' আমি বললুম, তা যদি না হ'ত, তা হলে একজন লোক পঞ্চাশজন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে—আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে আসছি কেন? তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।" একটু থেমে পুনরায় বললেন, "তাঁর লক্ষণ কি? যেখানে কার্য বেশী, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ।"

কেশবচন্দ্রের শক্তি ঈশ্বরেরই করুণায় লব্ধ, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ এ কথাই বোধ হয় বোঝাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, "আদ্যাশক্তি আর পরমব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নেই, যেমন জ্যোতি আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নেই, আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), পৃঃ ৮৫

ভাববার যো নেই। যেমন সাপ আর তির্যক গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যক গতি ভাববার যো নেই, আবার সাপের তির্যক গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নেই। আদ্যাশক্তি এই জীবজগৎ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন আর ছোকরাদের জন্য ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বলে তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন।"[১]

রামকৃষ্ণের কথায় কেশবচন্দ্র ও অন্যান্যরা হেসে উঠলেন। যিনি ঈশ্বরের মধ্যে সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে আছেন তাঁকে আলাদা সময় করে ঈশ্বর-ভাবনা করতে হবে? হাজরারা ও রকম কথা চিরকালই বলে—জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা যে পোষ্টাই হয় না।

রামকৃষ্ণ বললেন, "হাজরার কথা শুনে মহা-ভাবনা হ'ল। বললুম, "মা একি হ'ল? হাজরা বলে ওদের জন্য ভাব কেন?' তারপর কালীবাড়ীর মুহুরী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বলল মহাভারতে নাকি ঐ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। মহাভারতের এই নজীর পেয়ে তবে বাঁচলুম।"

ক্ষণ বিরতির পর পুনরায় বললেন, "হাজরার দোষ নেই। সাধক অবস্থায় সব মনটা নেতি নেতি করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় কিন্তু অন্য কথা। তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম-বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধহয় ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। তখন ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হয়েছেন। কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানি কম প্রকাশ।" রামকৃষ্ণ বলে চলেন, "ভাব সমুদ্র উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকে বেঁকে ঘুরে আসতে হ'ত। বন্যে এলে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। তখন সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হ'ল। আর ঘুরে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হ'ল।"

একটু থেমে গলাটাকে খাদে নিয়ে বললেন, "ঈশ্বর লাভের পর তাঁকে সবেতেই দেখা যায়।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছেন।-

"মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষে মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভেতর আরও বেশী প্রকাশ, যাদের কামিনী কাঞ্চন ভোগ করবার ইচ্ছে একেবারে নেই। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা হ'লে সে কিসে মন দাঁড় করাবে? তাই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে?"

কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণের কথা শুনে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, কখনও কখনও তিনি হেসে উঠছেন। রোগ যন্ত্রণা যেন একেবারে ভুলে গেছেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, "যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই সব করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি,

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ৯ম সংস্করণ পৃঃ ৮৬

প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।" তার মুখে বিরাজ করতে লাগল মধুর হাসি।

সকলে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, কথা শুনছেন নীরবে। রামকৃষ্ণ বললেন, "যার পুরুষ জ্ঞান তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও আছে।" কথা শুনে কেশব হেসে উঠলেন। নিবিড় চোখে চাইলেন রামকৃষ্ণের দিকে।

"যার অন্ধকার জ্ঞান আছে তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে।" কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে কেশবচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলেন অর্থাৎ বলতে চাইলেন, "কেমন ঠিক কিনা।"

কেশব সহাস্যে শির-সঞ্চালন করলেন।

"মা, কার মা?" রামকৃষ্ণ বলে চলেন "জগতের মা, যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করেছেন। আর ধর্ম-অর্থ কাম মোক্ষ যে যা চায় তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে, ছেলে খায় দায় আর বেড়ায়, সে অতশত জানে না।"

কেশবচন্দ্র মৃদু গলায় বললেন, "ঠিক তাই।"

কথা কইতে কইতে ভাবের ঘোর রামকৃষ্ণের অনেকটা কেটে গেছে। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবের সঙ্গে সহাস-সুন্দর কথা বলছেন। আশ্চর্য! যাঁর গুরুতর অসুখের খবর শুনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন, সে সব কোথায় ভুলে গেছেন! আর যিনি অসুস্থ হয়ে অসীম যন্ত্রণা কাতর, তাঁর আধি-ব্যাধি সব কোথায় যেন চলে গেছে। দু'জনের দেহ বোধ নেই, দেহাতীত আত্মার কথাতে মগ্ন হয়ে গেছেন, "তুমি কেমন আছ?" "কি কষ্ট হচ্ছে?" এ ধরণের কোন কথা আদৌ হচ্ছে না। কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পুণ্য কথা। আশ্চর্য! রামকৃষ্ণ বললেন, "ঈশ্বরকে খুব কম লোকই পেতে চায়। বাগান দেখেই অনেকে তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন? বাগান বড় না বাবু বড়? মদ খাওয়া হ'লে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসাবে আমার কি দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।"

রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের মুখপানে চেয়ে আছেন। কি দেখছেন তিনিই জানেন। ধীর কণ্ঠে বললেন, "তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার অসুখ হ'ল; রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, 'মা কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কব? তখন কলকাতায় এলে ডাব চিনি ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়।"[১]

অবাক হয়ে সকলে কেশবচন্দ্রের প্রতি রামকৃষ্ণের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা শুনছে।

—"এবার কিন্তু অতটা হয়নি।, ঠিক কথা বলব। তবে দু'তিন দিন একটু হয়েছে।"

কথার মধ্যে সরলতা ও প্রেমের স্পর্শ পেয়ে কেশবচন্দ্র রোমাঞ্চ অনুভব করলেন, তাঁর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। আবার রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তোমার অসুখ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ৯ম সংস্করণ পৃঃ ৯০

হয়েছে কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ও মা খানিক পরে দেখি কিনারার ওপর জল ধপাস করে পড়ছে আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়তো পাড়ের খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়ল।"[১]

বিষয়টি সহজ করতে চাইলেন অন্য উপমায় ;—

"কুড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাব হস্তি দেহ ঘরে প্রবেশ করে আর তোলপাড় করে। হয় কি জান? আগুণ লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে। আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম, ক্রোধ, এই সব রিপু নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।"

কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে তিনি একটু হাসলেন, তারপর বললেন, "তুমি মনে করছ সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবেন না। তুমি বাপু নাম লেখালে কেন?"

কথার ভঙ্গিতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সকলেরই মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে গেল। ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা—নাম লেখালে নিস্তার নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশব হাসপাতালের কথা শুনে বার বার হাসছেন, মৃদু মধুর হাসি। রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "হৃদু বলত, এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে কিন্তু ঈশ্বরের কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এল, এসে দেখে আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, 'এ কি পাগল, দু'খানা হাত নিয়ে বিচার করছে।" তারপর একটু থেমে পুনরায় বললেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা জেন। সকলই, তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"[২] বলে রামকৃষ্ণ গানের দুটি পদ গাইলেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল। তারপর তিনি বললেন, "শিশির পাবে বলে মালী বাসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকর শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে।"

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৮৯

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়), ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৯০

এ সম্পর্কে অন্যত্র উল্লেখ আছে :—

"তিনি আরও বলিলেন, "যাকে পাকা রকম পাইতে গেলে শরীরে এক একবার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার উপযোগী করিয়া লইবার সময় একবার খুব নাড়িয়া-চাড়িয়া লন। আমারও একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়া রক্ত উঠিত। সকলে বলিত আমার যক্ষা হইয়াছে আর বাঁচিব না।"

[ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ( অন্তঃবিবরণ ) পৃঃ ২০৪৮ ]

একথায় কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সঙ্গে হেসে উঠলেন। উভয়ের ভাবনা তো জীবন-মৃত্যুর পারে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর গাঢ় গলায় রামকৃষ্ণ অনেকটা আত্মগত ভাবেই বললেন, "ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে।"

আলাপ-আলোচনা চলছে, এমন সময় পূর্বদিকের দরজা দিয়ে কখন কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবী এসে দাঁড়ালেন। তিনি গড় হয়ে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন।

তিনি সারদাসুন্দরীকে দেখলেন। পুত্রের জন্য ব্যথিতা কিন্তু কল্যাণময়ী রূপ, প্রতি-প্রণাম জানালেন ও সেদিকে চেয়ে অনাবিল সুন্দর হাসি হাসলেন।

কেশব-জননী অস্ফুটে কি বললেন শোনা গেল না। উমানাথ তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি শুনে বললেন, "মা বলছেন তাঁর কেশবের অসুখটি যাতে সারে তেমন আশীর্বাদ করুন।"

"মা সুবচনী, আনন্দময়ীকে ডাক, তিনি দুঃখ দূর করবেন।" বললেন রামকৃষ্ণ। তারপর কেশবচন্দ্রের দিকে ফিরে হাসতে লাগলেন, বললেন, "ওগো বাড়ির ভেতর অত থেক না, মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরও ডুববে, ঈশ্বর কথা হ'লে আরও ভাল থাকবে।"

কেশব মৃদু হেসে বললেন, "হাঁ, তা ঠিক।"

"দেখি তোমার হাত দেখি," কেশবচন্দ্রের ডান হাতখানি নিজ হাতে রামকৃষ্ণ তুলে নিলেন তারপর হাতের ভর অনুভব করলেন।

"না তোমার হাত হালকা আছে, সুলক্ষণ। খলদের হাত ভারী হয়।"

তিনি বালক-সুলভ হাসি হাসছেন, কেশবচন্দ্রের মুখেও অনাবিল হাসি ভরে আছে। তাঁর মারাত্মক অসুখ। কয়েক ঘণ্টা আগেও বাড়ি বিষাদাচ্ছন্ন ছিল সে কথা এখন এ পরিবেশ দেখে কে বলবে? যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে বিষাদ ভাব কেটে গিয়ে হাসির আলো ঝলমল করছে। উমানাথ দরজার কাছে সারদাসুন্দরীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "মা বলছেন, তাঁর কেশবকে আপনি আশীর্বাদ করুন।"

এ কথা শোনা মাত্র কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। বোধহয় এতক্ষণে কেশবচন্দ্রের শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হলেন, "মা আমার কি সাধ্য। আশীর্বাদ করবেন তিনি, যিনি জগৎ পালন করেন। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"— তারপর উপমা প্রয়োগে কি চরম সত্যের ইঙ্গিত দিলেন? তিনি বলে চলেন, "ঈশ্বর দু'বার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু'ভাই জমি বখরা করে তখন। দড়ি দিয়ে মেপে বলে, 'এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার।' ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন যে আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে ঝগড়া করছে, এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।" ক্ষণিক বিরতির পর তিনি আবার বললেন, "ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখ, মা কাঁদছে। বৈদ্য এসেছে, দেখে বলছে, 'ভয় কি মা, আমি ভাল করব।' বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।"

এ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ? সকলের মনে একটা আশঙ্কার ভাব নেমে এল। আজ আরও দু'একবার তিনি এ ধরণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছেন। সবাই আশঙ্কা-

কাতর, ব্যথিতা। সারদাসুন্দরীর চোখ ছল-ছল করছে। রামকৃষ্ণের চোখ দুটিও ভার ভার।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের মুখে অপার্থিব হাসি। তাঁকে মনে হচ্ছে যেন অন্য এক জগতের মানুষ। স্থিতপ্রজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ী। কেশব কি কথা যেন বলতে চাইলেন কিন্তু কথা বলার মুখে হঠাৎ বেদম কাশি এল তাঁর। ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক কাশি। তিনি অনেকক্ষণ ধরে কাশতে থাকলেন, কাশি থামে না। কাশির ধমকে তিনি যেন কেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।, চোখের মণি দুটি যেন ঠিকরে বার হয়ে আসছে, কণ্ঠ-শিরাগুলি ফুলে ফুলে উঠছে, হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে আছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। তা দেখে সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছে। কেশবচন্দ্র আর বসে থাকতে পারছেন না।

ধরা গলায় রামকৃষ্ণ বললেন, "ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।"

কেশব রামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, তারপর অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দেওয়ালে হাত রেখে কম্পিত চরণে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। কারও সাহায্য তিনি নেবেন না। আশ্চর্য!

সকলে কেশবচন্দ্রের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন। ভেজা ভেজা চোখে সকলেই নীরব। রামকৃষ্ণ গভীর দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। নমস্কারের ভঙ্গিমায় তাঁর হাত দুটি জোরা।[১]

[১] (১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়)—দশম খণ্ড

(২) কেশবচরিত—চিরঞ্জীব শর্মা।

(৩) আচার্য্য কেশবচন্দ্র—গৌর গোবিন্দ রায়, অন্ত্যবিবরণ, পৃঃ ২০৪৭

## ২৬

আর বোধহয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে মরদেহে ধরে রাখা যাবে না। অনেকের যা আশঙ্কা ছিল, তাই ঘটল। এ পৃথিবীতে তাঁর কাজ বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে, তাঁর পরম প্রিয় ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের লগ্ন বুঝি এসে গেল। গত বছরে মাঘোৎসবের পরই তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন।[১] তবু বিশ্রাম না নিয়ে সমানে পরিশ্রম করে যেতে থাকেন। ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাঃ কেলি, ডাঃ দুর্গাদাস রায়, হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকদের সর্বরকমের প্রচেষ্টা, আত্মীয় পরিজনদের সেবাযত্ন মৃত্যুকে ঠেকাতে পারল না।

মঙ্গলবার, ৮ই জানুয়ারী—দুর্যোগ ঘনিয়ে এল।[২] ঐ দিনই সকাল দশটায় এই অপরিসীম শক্তিমান মহাত্মা অগণিত গুণমুগ্ধ মানুষকে অশ্রুসাগরে নিমগ্ন রেখে শান্তমনে পরমধামে প্রয়াণ করলেন।

ইন্দ্রপতন হ'ল। যুগপুরুষের প্রয়াণে অবসান হ'ল সম্ভাবনা পূর্ণ যুগের। অক্লান্ত কর্মী, ঈশ্বরভক্ত, জননেতা, সমাজ ও ধর্ম বিপ্লবী, ঐক্যসাধক মহান মানুষটি দেহত্যাগ করলেন। কঠিন অসুখ থেকে আর রক্ষা করা গেল না। অকাল মৃত্যুই বলা যায়। বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর।

খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত। শত্রু-মিত্র সকলেই ছুটে এ'ল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরলোকে। যারা ভালবাসে তাদের চোখে জল, যারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাদের আঁখিও ছলছল। সবাই আজ দেশবরেণ্য মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে কমল-কুটিরে জড়ো হয়েছে।

নিমতলা শ্মশান-ঘাটে বহন করে নিয়ে যাবার পূর্বে কেশবচন্দ্রের মরদেহ চন্দন ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হ'ল। দেহ ভাল বস্ত্র ও শালে আচ্ছাদিত করা হ'ল। সবাই পুলকে বিস্ময়ভরে দেখল কেশবচন্দ্রের মুখমণ্ডল থেকে এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। তা দেখে শোকাতুরা জননী বলে উঠলেন, "ওরে এযে মহাদেবের মূর্তি দেখছি।"

বিষাদাচ্ছন্ন দিন। ব্রহ্মানন্দ কেশবের মরদেহ নিয়ে বিশাল শোক-যাত্রা সংকীর্তনের সঙ্গে শ্মশান অভিমুখে চলেছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ শোকসন্তপ্ত। শেষ যাত্রায় ব্রাহ্ম, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ সবাই যোগ দিয়েছে। রাজ প্রতিনিধি থেকে দীন-দরিদ্র মানুষ কেউ বাদ নেই। চতুর্দিকে নিনাদিত হচ্ছে—"ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্, সত্যমেব জয়তে, জয়তু কেশবচন্দ্র।"

সেই কমনীয় জ্যোতির্ময় মূর্তি, সেই প্রশস্ত ললাট, তেজদীপ্ত ভঙ্গিমা, বিশাল নেতৃত্বের ব্যক্তিত্ব,ভক্তির সুষমা মণ্ডিত কান্তি, টাউন হলে বা বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা রত,

১ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ

২ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপদেশ দান রত বা প্রার্থনা রত, সেই মানুষকে আর দেখা যাবে না। সেই ওর্জস্বিনী বক্তৃতা, সেই মধুরস্রাবী মনোমোহিনী বাণী, সেই অতুলনীয় বাকভঙ্গিমা আর শোনা যাবে না।

যুগপুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের মরদেহ ভস্মিভূত হবে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশব অমর। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সে কথা চিরকাল লেখা থাকবে।

শ্মশানে শায়িত নীরব কণ্ঠ এক মহান বিশ্বপ্রেমিক। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের প্রিয়জন—মনের মানুষ। সরলতা আর সততার প্রতিরূপ সদ্য প্রয়াত মানুষটি ঈশ্বর পরায়ণ ভক্ত ছিলেন। মানুষের আত্মীক কল্যাণের জন্য এই গৃহী-সন্ন্যাসী নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। কলহরত অনুগত জনের পাদুকা মস্তকে স্থাপন করেছেন দীনভাবে, সমাজের আবিলতাকে, কুসংস্কারের প্রাবল্যকে রুদ্ধ করতে এই বিপ্লবী সংস্কারক জীবন পণ করেছেন। প্রিয়দর্শন মানুষটি সমগ্র ভারতে আরও একবার একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের কথা প্রচার করছেন। যুগপুরুষ কেশবচন্দ্র প্রতিভাধর। প্রেমিক ও মহাত্মা। তিনি প্রকৃতই এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

হতাদর মাতৃজাতির বেদনায় কাতর হয়ে অন্তরের অপরিসীম ব্যাকুলতায় কেশবচন্দ্র নারীজাগরণের উজ্জ্বল দিশারী হলেন। নারী-শিক্ষা-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের বলিষ্ঠ উদ্যোক্তা, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের স্থাপক, ভারতে প্রথম সুলভ সাহিত্য, সুলভ সংবাদপত্রের[১] জনক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

স্ব দেশীয় মানুষের দ্বারা পরিচালিত প্রথম ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্ম দিলেন কেশবচন্দ্র সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর'কে দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত করে। ঐ সংবাদপত্রে সে কালে দেশে রাজনৈতিক চেতনাও আনে। কিশোরদের জন্য মাসিক পত্রিকা "বালক বন্ধু"ও তার এক অভিনব সৃষ্টি। সম্ভবতঃ এদেশে এটিই সর্বপ্রথম বহুল জন প্রচারিত কিশোর পত্রিকা। মহিলাদের জন্য মাসিক পত্রিকা "পরিচারিকা" তাঁরই উদ্যম ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত হয়। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক এবং বহুবিবাহের বিরোধী কেশবচন্দ্রের সংস্কার চিন্তা ও কর্মোদ্যম সমাজ জীবনে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে। জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের একজন প্রধান উদ্যোক্তাও কেশবচন্দ্রকে বলা যায়।

ভারতবর্ষে প্রথম শিল্প-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ তাঁরই। কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষায় extempore বক্তৃতার সৃষ্টি করেছেন, বিপথগামী মদের বন্যায় ভেসে যাওয়া ইয়ং বেঙ্গলকে সংযত ও সতর্ক করেছেন, ভারতে খ্রীষ্ট ধর্মের আধিপত্য ও প্রগতিকে রুদ্ধ করেছেন, ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধিদের ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কি কর্তব্য সে বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রেখেছেন এবং তাঁর বক্তৃতাবলী "England's duties to India (24. 5. 1870)তে ইংল্যাণ্ডবাসীকে ভারতবর্ষের প্রতি তাদের কর্তব্যের সম্পর্কে সচেতন করে বলেছেন, "বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সমর্থক

---

১ সুলভ সমাচার—এক পয়সা মূল্যের এই সংবাদপত্রটি সে যুগে ধনীর অট্টালিকা হ'তে গরীবের পর্ণ পর্যন্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে কেশবচন্দ্র দেশে সুলভ সাহিত্যের সূচনা করেন। এর ভাষা এত সরল ছিল যে যার কেবল অক্ষর জ্ঞান আছে সেও পড়ে লেখার মানে বুঝতে পারত।

ও প্রচারক হিসাবে আমি সর্বপ্রকার মৃদু ও উগ্র যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিরোধের কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করি।"[১]

কেশবচন্দ্র উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে জাগ্রত ও বলশালী হতে আহ্বান জানিয়েছেন, মানুষের মনে এনেছেন স্বাধীনতার চেতনা। দেশে শ্রীচৈতন্যের পর তিনিই নতুন করে আবার প্রেম-ভক্তির স্রোত বইয়েছেন, ভারত-আশ্রম ও সাধন-কানন প্রতিষ্ঠা করে ভারতসংস্কারক সভা স্থাপন করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনিই প্রথম এর উপযোগিতা দেখিয়েছেন।

তারপর তাঁর অক্ষয়কীর্তি নব-বিধানের সৃষ্টি, ঐক্যসাধক সাম্যবাদী ঈশ্বর পরায়ণ মানুষটি সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবধারার মধ্যে পুরাতন সত্যকে নতুন করে উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। এক হিসাবে রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন কেশবচন্দ্র, সর্বোপরি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন।

তাই তাঁর বিয়োগ ব্যথায় বেদনার্ত মানুষের চোখ অশ্রুসজল। শত্রু-মিত্র সবাই কাঁদছে। কাঁদবে বৈকি—মতবিরোধ থাকলেও সবাই তাঁকে ভালবাসত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পূতঃ মরদেহে অগ্নিসংযোগ করা হ'ল, প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বুঝি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্। সত্যমেব জয়তে। জয়তু কেশবচন্দ্র।

দেশের মানুষের সঙ্গে মহামানব আর একজন কেশব-বিয়োগে শোকাশ্রু মোচন করলেন দক্ষিণেশ্বরে বসে। তিনি রামকৃষ্ণ, কেশব যাঁর মনের মানুষ। দুজনার আত্মার আত্মায় আত্মীয়তা। সংবাদ এল দক্ষিণেশ্বরে—কেশবচন্দ্র আর ইহ জগতে নেই।

তিনি দেহ রেখেছেন। যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই তবে সত্য হ'ল ? কেশব নেই—কেশব আর আসবে না। রামকৃষ্ণের বুকে ভাবনাটা ককিয়ে উঠে। প্রিয়জন হারানর বেদনায় তাঁর অন্তর কেঁদে উঠে—"মা গো, কেশব নেই তবে মনের কথা কইব কার সঙ্গে।" তাঁর প্রাণ শোকে হাহাকার করে উঠল, ব্যথায় তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঈশ্বরের পরম ভক্ত, পরম জ্ঞানী, বিগতস্পৃহ, কাম-কাঞ্চনে আসক্তি হীন, সুখে দুঃখে উদাসীন পুণ্যময় দৈবী মানুষ সাধারণ মানুষের মতই আজ শোক বিহ্বল। এই শোক বুঝি আরও গভীর।

রামকৃষ্ণের অন্তর শোকে ব্যথায় কতখানি যে আলোড়িত হয়েছে তা বোঝা গেল তাঁর আচরণে। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা গ্রহণ করলেন। তিনদিন তাঁর বেহুঁশের মত কাটল। তারপর শয্যা ত্যাগ করে উঠে বললেন, "ঐ নিদারুণ খবর পেয়ে আমার মনে হ'ল একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেছে।"[২]

তাঁর চোখ দুটি সজল, প্রিয় হারানর বেদনায় আর্ত। একটু থেমে বেদনা বিজড়িত কণ্ঠে পুনরায় বললেন, "কেশবের মৃত্যু আমাকে আধখানা করে দিয়ে গেল। সে ছিল

---

১ **K. C. Sen's lecture in England 1870.**

২ **শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (২য় ভাগ—স্বামী সারদানন্দ**

যেন এক বিরাট অশ্বত্থ গাছ, কত লোক ঐ গাছের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। আর দ্বিতীয় লোক কই এমন? আমরা তো কেবল তাল আর সুপুরি গাছ।"[১]

রামকৃষ্ণের মুখাবয়ব বড় করুণ দেখাল।

* * * *

কেশবচন্দ্রের তিরোধানের কিছুদিন পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের ঘরে একজন ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবের একখানি আলোকচিত্র টাঙ্গাতে উদ্যত হ'লে তা দেখে রামকৃষ্ণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং ধরা গলায় বলে উঠেন, "আমার কাছে ওটা রেখ না, কেশবকে ছবির মধ্যে দেখলে আমার বুক ভেঙ্গে যায়।"

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ বহুদিন নাকি কলকাতায় যান নি; কলকাতায় তিনি আসতে চাইতেন না। কেশবচন্দ্র নেই এ চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তাছাড়া কার সঙ্গেই বা কলকাতায় এসে মনের কথা কইবেন। মনের মানুষ কেশব নেই।

যুগপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিলেন এমনই প্রিয়জন।

১ "পরমহংসের উক্তি"—ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক লিখিত, ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা ১৬, ৯, ১৮৮৬তে পরিবেশিত Keshab Chandra and Ramkrishna by G. C. Banerjee পুস্তকের Chapter V. পৃঃ 217তে উদ্ধৃত।